দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৬৮ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা।। ২৫ জানুয়ারি ২০১৬।। ১০ মাঘ - ১৪২২
website : www.eswastika.com ।। প্রজাতন্ত্র বিশেষ সংখ্যা।।

জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা কি সংবিধানের মূল ভাবনাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে?

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

।। প্রজাতন্ত্র বিশেষ সংখ্যা।।

৬৮ বর্ষ ১৯ সংখ্যা, ১০ মাঘ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ

২৫ জানুয়ারি - ২০১৬, যুগাব্দ - ৫১১৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৭

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৯

তৃণমূলের মাফিয়াদের হাতেই এখন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি □ গূঢ়পুরুষ □ ১০

কালিয়াচক হামলা : সাংবিধানিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ইসলামি মৌলবাদীদের সরাসরি চ্যালেঞ্জ □ একলব্য রায় □ ১১

ভারতের সংবিধান ও গণতন্ত্র : বিশ্লেষণে ও সংশোধনে □ অম্লানকুসুম ঘোষ □ ১৩

এন জে এ সি অ্যাক্ট কি সংবিধানের মূল ভাবনাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে? □ সমীর পাল □ ১৬

সংবিধানের দ্বিমুখিতা এবং আমাদের রাজনৈতিক নেতারা □ তারক সাহা □ ১৯

ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস থেকে ফিরে □ বিনয়ভূষণ দাশ □ ২১

কি করব— বিদেশি ভাষার দাসত্ব, না মাতৃভাষার প্রতি আনুগত্য? □ সুতপা বসাক ভড় □ ২৫

পাকিস্তানেরই কায়দায় ছায়াযুদ্ধ চালাতে হবে □ সুবীর ভৌমিক □ ২৭

সাক্ষাৎকার : 'লড়াই করতে হবে রাস্তায় নেমে' : দিলীপ ঘোষ □ ২৯

গঙ্গাসাগরের একটুকরো ছবি কলকাতার বাবুঘাটে □ শুভাশিস রায় □ ৩১

বিলুপ্ত তীর্থক্ষেত্র গঙ্গাবাস □ গোপালকৃষ্ণ রায় □ ৩৮

তৃণমূল কংগ্রেসীদের হাতে সেনাদেরও নিস্তার নেই □ দেবব্রত ঘোষ □ ৪৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৪৭-৪৯

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ৩৫-৩৭ □ **অঙ্গনা : ৪১** □

নবাঙ্কুর : ৪৩-৪৪ □ **প্রাসঙ্গিকী : ৫০**

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ
জন্মশতবর্ষে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়

এই বছর পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ। আজকের ভারতবর্ষে এই ক্ষমতালিপ্সু ধান্ধাবাজ রাজনীতির পরিবেশে তিনি এক ব্যতিক্রম— রাজনীতির নিখাদ সোনা। একাধারে তিনি সন্ত, দূরদ্রষ্টা ও দার্শনিক। তাঁর রচিত 'একাত্ম মানববাদ' দর্শন এই সমস্যাসঙ্কুল বিশ্বকে উত্তরণের পথে এক নতুন ভাবনার সন্ধান দেয়। এইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন অমলেশ মিশ্র, রোহিনী প্রসাদ প্রামাণিক, তাপস দত্ত প্রমুখ।

Bagri Textiles
Shree Krishna Creation

43, Sir Hariram Goenka Street, 1st Floor, Kolkata-700 007
M: 9331012877
E-mail : saileshbagri@yahoo.co.in

With Best Compliments from -

ASSAM ROADWAYS PRIVATE LIMITED

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল -
৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বোধোদয়

এতদিনে বাঙালির বোধোদয় হইতেছে। রাজ্যে শিল্প লইয়া ইদানীং সবাই মুখর হইতেছেন। রাজ্যের শাসক তৃণমূল এবং বিরোধীদল সিপিএম অন্তত শিল্পের জন্য আগ্রহ দেখাইতেছে বলিয়া শোনা যাইতেছে। একদল শিল্পপতিদের লইয়া সম্মেলন করিতেছে তো অন্যদল শিল্পের জন্য পদযাত্রা করিতেছে। আসলে কেন্দ্রের মোদী সরকার শিল্পের আহ্বানে দেশে যে বিভিন্ন উদ্ভাবনী শক্তির প্রকাশ ঘটাইতেছে তাহার ফলেই রাজ্যদলগুলিও শিল্পের জন্য সরব হইতেছে। যদিও কাহারও কাহারও মুখ এবং মুখোশ লইয়া সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। যেমন এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শিল্পপতিদের আহ্বান জানাইতেছেন, আবার অন্যদিকে গত চার বছরে এই রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলার যে রেকর্ড তাহারা গড়িয়াছেন তাহাতে সাধারণ শিল্পপতিরা অতিষ্ঠ হইয়া পালাইতেছেন। তৃণমূল সরকার যে কথা বলিতেছে, তাহার সহিত বাস্তবের বেশ ফারাক। শালবনী সিমেন্ট কারখানা, হলদিয়া বন্দর সম্প্রসারণ, সমুদ্র বন্দর সম্প্রসারণ, হাইওয়ে তৈরি, দেওচা-পাঁচাসি খনি, ছয়টি নূতন টাউনশিপ, ন্যাশনাল অপটিক্যাল ফাইবার হইতে টেক্সটাইল পার্ক—সব ক্ষেত্রেই সরকার এবং লগ্নিকারীদের কথার মধ্যে রহিয়াছে বিস্তর ফারাক। একটানা ৩৪ বৎসরে বামফ্রন্ট সরকার যাহা করিয়া গিয়াছে, সেই একই চর্চা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারও করিতেছে। এই পথে সত্যই কি শিল্পের জোয়ার বহিবে? আর যদি ধরিয়াও লওয়া যায়, শিল্পের জোয়ার আসিবে তবে কোন শিল্পের জোয়ার আসিবে? সেই শিল্পে কি কাজ জুটিবে বেকারদের? কর্মসংস্থানমুখী শিল্পই যদি গড়িয়া না উঠে, তাহা হইলে সেই শিল্প কোন চরিত্র লইয়া গড়িয়া তোলা হইবে? এই রাজ্যের শাসকদলের মধ্যে সিন্ডিকেট নামক সমস্যাটি যে-কোনো আর্থিক প্রকল্পের ক্ষেত্রে বিষম সমস্যার সৃষ্টি করিয়া চলিতেছে। শিল্প স্থাপনের জন্য প্রয়োজন পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং সেই পরিকাঠামোকে সঠিক পথে সচল রাখিবার ব্যবস্থা করা। এই রাজ্যে শিল্পের জন্য প্রচার চলিতেছে সরকারি উদ্যোগে কিন্তু রাজ্যে বিগত চার বৎসরে যে নারকীয় ঘটনা ঘটিতেছে এবং নারীধর্ষণ হইতে খাগড়াগড়, কালিয়াচক থানা আক্রমণ—শিল্প বাণিজ্যের উন্নয়ন করিবার প্রক্রিয়া এই পরিস্থিতিতে আদৌ সম্ভব? জমি মাফিয়াদের রমরমা। তোলাবাজি হইতে মুখ্যমন্ত্রী কি তাঁহার দল অথবা সরকারকে মুক্ত করিতে পারিয়াছেন? এই রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, জমি অধিগ্রহণের প্রশ্নে এই রাজ্যের অবস্থান শিল্পবিরোধী। মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়া থাকেন, শিল্প গড়িতে এই রাজ্যে জমির অভাব হইবে না কিন্তু সেই জমি কোন স্থানে তাহার উত্তর নাই। বস্তুত শিল্পের জন্য যে মৌলিক বিষয়গুলির প্রয়োজন যেমন জমি, শিল্পবান্ধব পরিবেশ কোনোটাই এই রাজ্যে নাই। বামফ্রন্ট রাজ্যে শিল্পের সর্বনাশ করিয়া গিয়াছে, তৃণমূল এখন শিল্পের নামে তামাশা করিতেছে। সিপিআইএম আজ শিল্পের নামে পদযাত্রা করিতেছে কিন্তু তাঁহাদের রাজত্বেই বাংলায় একের পর এক শিল্প বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শ্রমিকের অধিকারের নামে শিল্পপতিদের হেনস্থা এবং ধর্মঘটের ফলে বহু শিল্প বাংলা হইতে বিদায় লইতে বাধ্য হইয়াছে। যে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আজ শিল্পের জন্য পদযাত্রা করিতেছেন তাঁহার দাম্ভিক কার্যকলাপের জন্যই সিঙ্গুর এবং নন্দীগ্রামে চরম অশান্তির সৃষ্টি। এই কারণে বাংলার শিল্পের এই দুর্দশা চলিতেছে। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীও কি এই দায় হইতে মুক্ত হইবেন? এই রাজ্যে শিল্পের পরিবেশ নাই কিন্তু শিল্পের নামে স্লোগান আছে। বাংলার মানুষ কিন্তু এই বন্ধ্যা রাজনীতি হইতে মুক্ত হইতে চাহিতেছেন। তাই শিল্প লইয়া মানুষ আশান্বিত। রাজনৈতিক দলগুলি বিবাদ ভুলিয়া অগ্রণী ভূমিকা লইলে মানুষ উপকৃত হইবে। এখানে ইগোর কোনো স্থান নাই। আর্থ-সামাজিক উন্নতির কথা মাথায় রাখিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গে শিল্প আসুক, কর্মসংস্থান হোক বাংলার মানুষের।

সুভাষিতম্

ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ।।

বংশের জন্য একজনকে ত্যাগ করা উচিত। গ্রামের জন্য বংশ ত্যাগ করা উচিত। দেশের জন্য গ্রাম ত্যাগ করা উচিত। নিজের জন্য পৃথিবী ত্যাগ করা উচিত।

With Best Compliments from :

R. C. Bhandari

36, Basemant,
8, Camac street
Kolkata–700017

Baijnath Shreelal

-: Mfgs. of :-

Handloom Silk,
Furnishing Cloth and
Cotton Dress
Materials

Head Office
Nathnagar, Bhagalpur (Bihar)
Tel. - 0641-2500437

Branch Office
193/1, Mahatma Gandhi Road
Kolkata - 700 007, Phone : 2270 0834
E-mail : bajopm@detaone.in

With best Compliments from :

তোমরা যদি ধর্ম ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাত্য জাতির জড়বাদ-সর্বস্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হও, তোমরা তিনপুরুষ যাইতে না যাইতেই বিনষ্ট হইবে।

—স্বামী বিবেকানন্দ
(৫/৪৬)

BHARAT STEEL INDUSTRIES

প্রবীণ সাংবাদিক গোপালকৃষ্ণ রায়ের জীবনাবসান

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ চলে গেলেন প্রবীণ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক গোপালকৃষ্ণ রায়। গত ১৭ জানুয়ারি, রবিবার সকাল ৬ টায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

কয়েকদিন ধরেই তিনি অসুস্থ ছিলেন। এক সপ্তাহ আগেই 'লুপ্ত তীর্থ গঙ্গাবাস' নামে একটি লেখা পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু স্বস্তিকার ২৫ জানুয়ারি সংখ্যায় তা প্রকাশিত হওয়ার আগেই তিনি চলে গেলেন।

পূর্ববঙ্গ, অধুনা বাংলাদেশের পাবনা জেলায় ১৯৩৪ সালের ১ জুলাই তাঁর জন্ম। কিন্তু তাঁর ছাত্রজীবন কেটেছে পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগরে। ১৯৭১ সালে তাঁর সাংবাদিক জীবন শুরু। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তিনিই প্রথম রিপোর্ট করেন। ইউ এন আই-এর স্পেশাল করসপন্ডেন্ট হিসেবে তিনি বাংলাদেশে যান। কলকাতা প্রেস ক্লাবের তিনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন। জীবনের শেষ কয়েক বছর তিনি বাংলা সাহিত্যের পরিমণ্ডলে বিচরণ করেন। 'ডোনার ফাদার' তাঁর প্রথম উপন্যাস। ভারতবর্ষে কোনো নলজাতক নিয়ে লেখা এটাই প্রথম উপন্যাস। কিংবদন্তী নায়িকা সুচিত্রা সেনের অন্তরঙ্গ জীবন নিয়ে তিনি লিখেছেন— 'সুচিত্রার কথা'। তাঁর লেখা 'হরিলক্ষ্মীর আত্মকথা' বিবেকানন্দ সাহিত্য পুরস্কারে সম্মানিত। সাধারণ মানুষের, বিশেষত অবহেলিত মেয়েদের কথাই তাঁর লেখায় ঘুরে ফিরে এসেছে।

গোপালবাবু অকৃতদার ছিলেন। সকলের সঙ্গেই বিশেষত, সাপ্তাহিক স্বস্তিকা ও পুস্তক প্রকাশক প্রিটোনিয়া'র সঙ্গে ছিল আত্মীয়তার সম্পর্ক। তাঁর প্রয়াণে স্বস্তিকা পরিবার গভীর শোকাহত।

জামিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যালঘু তকমা বাতিলের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তকমা পাওয়ার যোগ্য কিনা তা নিয়ে দিল্লীতে শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক। সম্প্রতি অ্যাটর্নি জেনারেল মুকুল রোহতগি বলেছেন যে জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে কোনোভাবেই সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে না। ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য গঠিত জাতীয় কমিশন এই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে সংখ্যালঘু তকমা দেয়। যদিও বিষয়টি আদপেই বিতর্কের ঊর্ধ্বে ছিল না। তৎকালীন কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী কপিল সিব্বল ও সংখ্যালঘু উন্নয়নমন্ত্রী সলমন খুরশিদের মধ্যে যে পত্র-বিনিময় হয় এনিয়ে তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যেই মতানৈক্যের বিষয়টি সামনে চলে আসে। এমনকী কপিল সিব্বলের পূর্বসূরী কংগ্রেস নেতা তথা ইউপিএ-১-র মানব সম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী অর্জুন সিংহও ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে সংখ্যালঘু আখ্যা দেওয়ার বিরোধী ছিলেন।

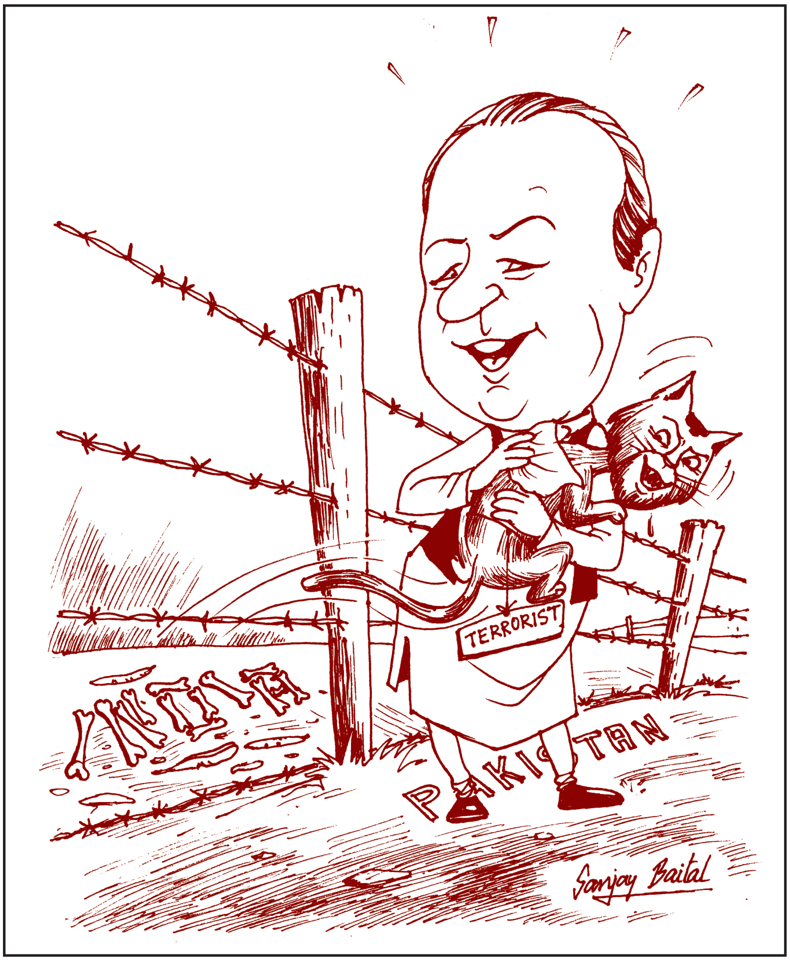

তৃণমূলের মাফিয়াদের হাতেই এখন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি

গূঢ় পুরুষের কলম

রাজ্য বিধানসভার ভোট যতই এগিয়ে আসছে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্বৃত্তায়ন ততই বাড়ছে। দলের মধ্যে গোষ্ঠী কোন্দলে খুন হয়ে যাওয়াটা এখন প্রতিদিনের ঘটনা। রাজ্যের নেতাদের কথা জেলার নেতারা শুনছেন না। আবার জেলায় নেতাদের কথা নীচুতলার দলীয় কর্মীরা পাত্তা দিচ্ছেন না। দলের মধ্যে খুনোখুনি আরও বাড়বে নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের টিকিট বিলির সময়। চোখ বন্ধ করে বলে দেওয়া যায় যে বিধানসভার ২৯৪টি আসনের প্রতিটিতে তৃণমূলের এক বা একাধিক গোঁজ প্রার্থী থাকবে। তৃণমূল নেত্রী সব জানেন বলেই ঘোষণা করেছেন যে একমাত্র তিনিই দলীয় প্রার্থী মনোনয়ন করবেন। জেলার নেতারা প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে কোনোরকম সুপারিশ পর্যন্ত করতে পারবেন না। কোনো গণতান্ত্রিক দলে এমন চরম ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা মোটেই সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেসকে গান্ধী পরিবারের দাস করেছিলেন। আজও সেই দাসত্ব চলছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অনুগামীদের ব্যক্তিগত দাস করার চেষ্টায় আছেন।

সিপিএম থেকে দল বদল করে আসা লুম্পেনরাই এখন তৃণমূল নেত্রীর মাথাব্যথার কারণ। সম্প্রতি রেড রোড কাণ্ডের দুর্বৃত্ত সাম্বিয়া তৃণমূল নেতা মহম্মদ সোহরাবের পুত্র। সাম্বিয়ার বিবাহের পার্টিতে তৃণমূলের ছোট-বড় নেতাদের উপস্থিতি নজর কেড়েছিল এলাকার মানুষের। সেই ভোজ খেয়ে যাওয়া নেতারাই এখন মহম্মদ সোহরাবকে চিনতে পারছেন না। বীরভূমের খয়রাশোলে স্থানীয় তৃণমূল নেতা শেখ সইফুল খুন হয়ে যাওয়ার ঘটনায় সিপিএম থেকে তৃণমূলে আসা লুম্পেনরাই জড়িত বলে পুলিশের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে। এই জেলারই ময়ূরেশ্বরের থানায় হামলা চালিয়ে পুলিশ পেটানোর ঘটনায় শাসক দলের মুখ পুড়েছে। কারণ, ওই ঘটনায় জড়িত হামলাকারীরা সকলেই তৃণমূলের সমর্থক কর্মী। সকলেই একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষজন।

তবে সবচেয়ে ভয়ের এবং আশঙ্কার কারণ বাংলাদেশিদের ব্যাপক অনুপ্রবেশ। সম্প্রতি হুগলী নদীর তীরে রায়চকের কাছে কুকড়হাটিতে একটি ইটভাটা থেকে ৫১ জন বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তারের ঘটনা রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসনকে উলঙ্গ করে দিয়েছে। সল্টলেক উপনগরীর রাজারহাটকে ঝাঁ চকচকে স্মার্ট সিটি করার কাজ চলছে। এর নির্মাণকাজে যুক্ত শ্রমিকদের ৭০ শতাংশই বাংলাদেশের লোক। ঠিকাদারদের বক্তব্য, বাংলাদেশি শ্রমিকরা অনেক কম মজুরিতে কাজ করে। পুলিশের নজর এড়িয়ে এত বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি শ্রমিকের উপস্থিতি গোয়েন্দা ব্যর্থতাকেই তুলে ধরছে। বর্ডার টপকে এত দূরে বাংলাদেশিরা চলে আসছে দলে দলে অথচ রাজ্যের পুলিশ এবং সীমান্তের প্রহরারত বিএসএফ জানতে পারছে না ভাবলে অবাক লাগে। আসলে এ সবই তৃণমূল নেত্রীর তোষণনীতির বিষফল। নিঃসন্দেহে পশ্চিমবঙ্গ এখন অনুপ্রবেশকারীদের স্বর্গরাজ্য। তৃণমূলের মাফিয়াদের হাতেই এখন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি।

মালদহের কালিয়াচকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার কিছুটা খবর স্বস্তিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এই ঘটনা তৃণমূলের রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের ভয়ঙ্কর চেহারা মালদহের মানুষজনকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে। কালিয়াচকের দুর্বৃত্তায়নের শুরু বাম আমলে মোজমপুর-নারায়ণপুর থেকে। মোজমপুরের মাথা ছিল সিপিএমের আসাদুল্লা বিশ্বাস। নারায়ণপুর ছিল কংগ্রেসের তুহুর আলির দখলে। এলাকা দখলের লড়াইতে খুন হয়ে যায় তুহুর আলির ছেলে। অভিযোগ ওঠে আসাদুল্লার বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যে রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল ঘটেছে। সুযোগ বুঝে তৃণমূলে ঢুকে পড়ে আসাদুল্লা এবং তার অনুগামীরা। গত পঞ্চায়েত ভোটে সিপিএমের শক্ত ঘাঁটি মোজমপুর আসাদুল্লার হাত ধরে তৃণমূল হয়ে যায়। আসাদুল্লা গোষ্ঠীর গুণ্ডাদের দাপাদাপিতে অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েতে বিরোধীরা প্রার্থী দেওয়ার সাহস দেখায়নি। আসাদুল্লা কালিয়াচকের ১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাহুবলী বেতাজ বাদশা বনে যায়। কালিয়াচক থানাকে সে তার ব্যক্তিগত বৈঠকখানা বানিয়ে ফেলেছে। একাধিক খুনের ঘটনায় আসাদুল্লা অভিযুক্ত হলেও শাসকদলের হাত মাথায় থাকায় তাকে আজও গ্রেপ্তার করা যায়নি।

কালিয়াচকে দাঙ্গা হাঙ্গামা, থানা পোড়ানো, হিন্দুদের দোকান লুঠ ইত্যাদি অপরাধে যাদের নাম উঠে আসছে সেই কেতাবুদ্দিন, আসাদুল্লা, বকুল শেখ, রুকু শেখ, জাকির শেখরা সকলেই সিপিএম ছেড়ে যোগ দিয়েছে তৃণমূলে। এই লুম্পেনরাই কালিয়াচক-সুজাপুরে সমান্তরাল প্রশাসন চালাচ্ছে। পুলিশের হাত পা বাঁধা। দুর্বৃত্তরা সকলেই মালদহের এক প্রভাবশালী মন্ত্রীর ছত্রছায়ায় রয়েছে। তৃণমূল নেত্রী বিশ্বাস করেন যে এই দুর্বৃত্ত লুম্পেনরাই ভোটে দলকে জেতাবে। একদা সিপিএম এই দুর্বৃত্তদের দিয়েই ভোটে জিতেছিল। এখন সেই দুর্বৃত্তদের হাতে মার খেয়ে প্রাণ বাঁচাতে ইঁদুরের গর্তে লুকিয়েছে। একই পরিণতি অপেক্ষা করছে তৃণমূলের জন্য। কারণ রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়নের চাকা গড়ায় ক্ষমতা বদলের সঙ্গে তাল রেখে। এটাই নিয়ম।

কালিয়াচক হামলা : সাংবিধানিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ইসলামি মৌলবাদীদের সরাসরি চ্যালেঞ্জ

একলব্য রায়

পশ্চিমবঙ্গ ভিত্তিক মিডিয়ার উপর নির্ভরশীল মানুষেরা ঘুণাক্ষরেও টের পাননি গত ৩ জানুয়ারি কালিয়াচকে এত বড় একটি ঘটনা ঘটে গেল। আনন্দবাজার গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করে কালিয়াচক সম্পর্কে এমন খবর করেছে যা থেকে কোনো ভাবেই এত বড় ঘটনা আঁচ করা সম্ভব নয়। গত ৪ জানুয়ারি সোমবার দুপুরবেলা মালদহের কালিয়াচকের বাসিন্দা আমার এক ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির ভীতসন্ত্রস্ত আতঙ্কিত ব্যক্তির ফোন পেয়ে চমকে গিয়ে রিমোট হাতে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখা গেল একমাত্র জি-নিউজ ছাড়া বাংলা নিউজ চ্যানেলগুলিতে কালিয়াচক নিয়ে কোনো খবর নেই। ইন্টারনেট ঘেঁটে দেখা গেলো একমাত্র দৈনিক জাগরণ গুরুত্ব দিয়ে কালিয়াচকের ঘটনা বিস্তারিত ছেপেছে।

জি নিউজ দু'দিন ধরে গুরুত্ব সহকারে এই খবর পরিবেশনের পাশাপাশি এই ঘটনা আইনের শাসন ও সাংবিধানিক ব্যবস্থার প্রতি বড় ধরনের প্রত্যক্ষ হুমকিস্বরূপ বলে তুলে ধরে। দাদরির ঘটনার পর দেশে অসহিষ্ণুতার পরিবেশ দেখতে পাওয়া মিডিয়া, পুরস্কারত্যাগীদের একপেশে সংবেদনশীলতা ও সেকুলার রাজনৈতিক দলগুলির নীরবতা নিয়ে লাগাতার প্রশ্ন তোলার পর আরো দু'-একটি টিভি চ্যানেল কালিয়াচক নিয়ে নীরবতা ভঙ্গ করে। পরিচিত কয়েকটি মিডিয়া হাউসে প্রশ্ন করাতে উত্তর এলো— সেনসেটিভ বিষয়, উত্তেজনা ছড়ানোর ভয়ে ওটা কভার করা হয়নি।

প্রশ্ন হচ্ছে, উত্তেজনা ছড়ানোর ভয় কি

সত্যিই দায়িত্বশীল আচরণ না অজুহাত মাত্র? উত্তেজনা ছড়ানোর ভয় থাকলে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার বারুদ ভরা দাদরি ঘটনা নিয়ে মিডিয়া এতটা মাতলো কী করে? কালিয়াচকের ঘটনা কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা উত্তেজনার ঘটনা নয়। এই ঘটনা যে ভারতের সাংবিধানিক ব্যবস্থার বহুত্ববাদী বৈশিষ্ট্যের বিরুদ্ধে ইসলামিক মৌলবাদীদের সরাসরি চ্যালেঞ্জ এই বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ হজরত মহম্মদকে নিয়ে কথিত বয়ানের জন্য ২০১৫-র ডিসেম্বরের শুরুতেই জাতীয় নিরাপত্তা আইনে কমলেশ তিওয়ারীকে গ্রেপ্তার করে উত্তরপ্রদেশ সরকার জেলে পুরে দিয়েছে। কমলেশ তিওয়ারী এখন একা, কোনো সংগঠন ওর পাশে দাঁড়ায়নি। কমলেশ তিওয়ারী অন্যায় করেছে। এই অন্যায়ের জন্য ভারতীয় দণ্ড বিধি অনুসারে তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে।

এই গ্রেপ্তারি নিয়েও কিন্তু উত্তরপ্রদেশ সরকারের দ্বিচারিতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মৌলানা অনবারুল হক নামে এক মৌলবি সাংবাদিকদের ডেকে প্রকাশ্যে কমলেশ তিওয়ারীর মাথার দাম ৫১ লক্ষ টাকা ঘোষণা করে ফতোয়া জারির পাশাপাশি তার পক্ষে যে আর বেঁচে থাকা সম্ভব নয় সে হুমকিও দিয়ে রেখেছে। কমলেশ তিওয়ারীকে জেলে পুরলেও একই অপরাধে অভিযুক্ত ভারতীয় সাংবিধানিক ব্যবস্থার প্রতি আস্থাহীন ওই মৌলবি কিন্তু বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে গ্রেপ্তার হওয়ার একমাস বাদে কমলেশ তিওয়ারীর ফাঁসির দাবি তুলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জবাব চেয়ে বড়সড় জমায়েতের নামে থানা আক্রমণ করে পুলিশ কর্মীদের পিটিয়ে বের করে দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র লুটপাট করা, নথিপত্র থেকে শুরু করে থানা চত্বরে থাকা যানবাহন জ্বালিয়ে দেওয়া, বেছে বেছে হিন্দুদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে, বাড়িঘরে লুটপাট চালানো, মন্দির অপবিত্র করা, মা বোনেদের শ্লীলতাহানি করা কি দেশ বিরোধী সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ নয়? পেট্রোল, কেরোসিন, লাঠি, পিস্তল, বোমা, বন্দুক, আগ্নেয়াস্ত্র-সহ নানারকম অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এত বড় জমায়েত এবং কাজ হাসিল করে নিখুঁত দ্রুততার সঙ্গে সরে পড়া পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া কোনো ভাবেই সম্ভব নয়। ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর বাড়তি ফোর্স আনিয়ে দশজনকে গ্রেপ্তার করে তুলে আনলেও এদেরকে ছাড়িয়ে নিতে পরের দিন অর্থাৎ ৪ জানুয়ারি আবার থানা আক্রমণ করা

হয়। এদিনও রক্ষণাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ প্রহরারত পুলিশ কর্মীদের ভীতসন্ত্রস্ত আতঙ্কিত মুখমণ্ডলের দৃশ্য ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সৌজন্যে আমরা দেখেছি।

আফিম চাষ, মাদক পাচার, জালনোটের কারবার, অনুপ্রবেশ, নারী পাচার, অবৈধ অস্ত্র ও বিস্ফোরকের কারবার, খুন খারাবি-সহ সমস্ত রকম দেশবিরোধী ক্রিয়াকলাপ কালিয়াচক এলাকার নিত্যদিনের ঘটনা। বোমাবাজি, খুন, এলাকা দখলকে ঘিরে সন্ত্রাস এই এলাকায় গা সওয়া ঘটনা। স্থানীয়দের অনেকেরই বক্তব্য, বড় ধরনের বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে ৩ ডিসেম্বরের জমায়েতে সীমান্তপারের বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরাও তাণ্ডব চালিয়েছে। একটি সূত্র বলছে, থানার সিসি টিভি ফুটেজেও নাকি বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের উপস্থিতি ধরা পড়েছে। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে থানার অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, নথি ধ্বংস, ভাঙচুর চালানো, অগ্নি সংযোগের ঘটনাগুলি এমন ভাবে ঘটানো হয়েছে যে তাতে নিখুঁত পরিকল্পনার ছাপ রয়েছে এবং উত্তেজিত উন্মত্ত ভিড়ের পক্ষে কখনই এমন নিখুঁতভাবে ধ্বংসলীলা চালানো সম্ভব নয়। পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছুক প্রশাসনের বিভিন্ন সূত্র বলছে, জালনোটের কারবার, মাদক পাচারে অভিযুক্ত দাগিদের বাঁচাতে নথি ধ্বংস করতে এবং বিভিন্ন সময়ে বাজেয়াপ্ত করা অস্ত্র লুণ্ঠন করতেই নাকি ধর্মীয় জমায়েতের আড়ালে ঘটানো হয়েছে কালিয়াচক কাণ্ড। প্রশ্ন হচ্ছে, দুষ্কৃতীরা যদি ধর্মীয় জমায়েতকে ব্যবহার করেই থাকে তাহলে মুসলমান সমাজের শিক্ষিত সজ্জন দেশপ্রেমিক মানুষেরা এরকম একটি দেশবিরোধী তাণ্ডবের প্রতিবাদে ও নিজেদের ধর্মকে কলঙ্কিত করার প্রতিবাদে রাস্তায় নামলেন না কেন?

কালিয়াচক কাণ্ডে রাজ্য সরকারের ভূমিকা দেখে স্থানীয় মানুষ হতবাক হয়ে গেছে। প্রশাসন এত দ্রুততার সঙ্গে তাণ্ডবের চিহ্ন মুছে দিয়ে থানাকে ঝকঝকে করে তুলেছে যে তাতে সরকারের বিরুদ্ধে পুরো ঘটনা লুকোনোর অভিযোগ উঠছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিভিন্ন মিডিয়ার সূত্র বলছে ৩ জানুয়ারিতে ঘটনা ঘটার পর থেকে দুষ্কৃতীদের মোকাবিলায় সরকার যতটা তৎপর ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি তৎপর ছিল মিডিয়ার মুখ বন্ধ করতে। এই সূত্রের মতে রাজ্য সরকারের নিষেধের জন্যই নাকি পশ্চিমবঙ্গ ভিত্তিক কোনো মিডিয়া কালিয়াচককে তুলে ধরার স্পর্ধা দেখাতে পারেনি। সরেজমিনে দেখার উদ্দেশ্যে কালিয়াচকগামী ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য ও কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলকে মালদাতে নানা অজুহাতে আটকে দিয়ে রাজ্য সরকার নিজে থেকেই প্রমাণ করে দিয়েছে কালিয়াচক কাণ্ড গোপন করার সরকারি প্রয়াসের অভিযোগ অমূলক নয়।

প্রশ্ন হচ্ছে, ভোটের লোভে ইসলামিক মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার পর তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকার কি দেশদ্রোহীদেরও প্রশ্রয় দিতে শুরু করলো। অবশ্য এই সরকারের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ নতুন নয়। খাগড়াগড় কাণ্ডের পর ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীদের প্রশ্রয় ও আশ্রয় দেওয়া, বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেওয়া জামাতের দুষ্কৃতীদের প্রত্যক্ষভাবে ভোটের কাজে লাগানো, জেহাদি ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিকে রাজ্যসভায় পাঠানোর অভিযোগে তৃণমূল কংগ্রেস অভিযুক্ত হয়েই আছে।

সাময়িক ভাবে সহায়ক মনে হলেও জেহাদি সন্ত্রাসবাদীরা কখনো কারো আপন হয় না। এই ধরনের অপশক্তি ফ্যাঙ্কেনস্টাইন হয়ে এদের মদতদাতা, সৃষ্টিকর্তার উপর আঘাত হানবে এটাই ইতিহাসের বার্তা। ভিন্দ্রানওয়ালাদের প্রশ্রয়ের পরিণামে ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু। তার পরিণামে শিখহত্যা। জিন্নার নেতৃত্বে বেড়ে ওঠা মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে প্রশ্রয় দেওয়ার পরিণামে দাঙ্গা ও দেশভাগের মতো ঘটনা দেখিয়ে দিয়েছে এই ধরনের আঘাতের অভিঘাত সামলাতে গিয়ে দেশে বিপর্যয় নেমে আসে এবং বেদনাদায়ক স্থায়ী ক্ষত সৃষ্টি হয়।

মিডিয়া সরকার নিয়ন্ত্রিত নয়। দেশের ধর্মনিরপেক্ষ সাংবিধান- সম্মত প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার প্রতি প্রত্যক্ষ হুমকিস্বরূপ এই ঘটনাকে শুধুমাত্র উত্তেজনা সৃষ্টির অজুহাতে কিংবা রাজ্য সরকারের অপসন্দ বলে এড়িয়ে যাওয়া কোনো ভাবেই বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না। ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নীরবতাও বিরূপ প্রভাব ফেলছে আমজনতার মধ্যে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এই ধরনের নির্লজ্জ মুসলমান তোষণ, ক্ষোভের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান বিরোধী সাম্প্রদায়িক মানসিকতা ও ভোট ভাবনার জন্ম দিচ্ছে সমাজের সর্বস্তরে। রাজনীতির কারবারিদের কাছে মানুষের এই ক্ষোভ হতাশা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব যে মিডিয়ার, সেও নানা অজুহাতে আশ্চর্যজনক ভাবে নীরব। ফলে মিডিয়া গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ কিনা সে প্রশ্নও উঠেছে।

চিটফান্ডের মতো অনৈতিক অবৈধ ব্যবসায়ীরাও নিজেদের প্রয়োজনে মিডিয়া হাউস চালাতে পারে এবং অন্যান্য মিডিয়াকে ব্যবহার করতে পারে। সারদা কাণ্ডের দৌলতে এই বিশ্বাস এখন আম জনতার মনে গেঁথে গিয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টির লোকেরা নিজেদের ভাবাদর্শ প্রচারের জন্য অর্থের প্রভাবে, রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রভাবে একশ্রেণীর মিডিয়া ও মিডিয়ার সঙ্গে যুক্ত বড়বড় মাথাদের কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতো সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনে তা স্পষ্ট হয়ে উঠে। এখন একই অভিযোগ শোনা যায় ভ্যাটিকান সিটি, পেট্রোডলার সমৃদ্ধ বিভিন্ন ইসলামিক দেশ ও সংগঠনের বিরুদ্ধে। কালিয়াচক কাণ্ডের পর মানুষের মনে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে পেট্রোডলার সমৃদ্ধ জেহাদি পলিটিক্যাল ইসলামের অর্থের প্রভাবে এই ধরনের দেশবিরোধী ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মিডিয়া হাউস বোবা-কালা ভূমিকা নিচ্ছে না তো? বিভিন্ন মাদ্রাসার মতো পেট্রোডলারে মিডিয়া হাউসগুলি পুষ্ট হচ্ছে না তো? প্রশ্ন অনেক, এর উত্তর দেওয়ার দায়িত্ব সমাজের সৎ রাজনীতিক, চিন্তাবিদ, সমাজবিদ ও সুধী সজ্জন সচেতন নাগরিকদের। তাঁদের তরফেও আশ্চর্যজনক নীরবতা দেখে এটাই মনে হয় অসৎ মানুষের কর্মকাণ্ডে নয় সমাজ ধ্বংস হয় সৎমানুষের নিষ্ক্রিয়তায়। ■

ভারতের সংবিধান ও গণতন্ত্র বিশ্লেষণে ও সংশোধনে

অম্লানকুসুম ঘোষ

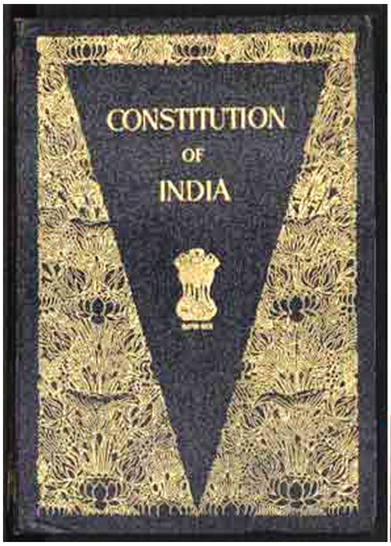

আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষ নানান কীর্তির মধ্যে দিয়ে সর্বত্র প্রশংসিত ও বন্দিত। এই কীর্তিসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র হওয়া। কীর্তিমুকুটের আরেকটি পালক হলো বিশ্বের প্রাচীনতম গণতন্ত্রের (মহেঞ্জোদাড়ো-হরপ্পা) জন্মদাত্রী হওয়া। বৃহত্তম ও প্রাচীনতম গণতন্ত্রের এই দ্বৈতসম্পদে সম্পন্ন ভারতবর্ষের বর্তমান গণতান্ত্রিক কাঠামো নিয়ে গণতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে কিছু বিশ্লেষণমূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

গণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র কথাটির অর্থ হলো গণের বা প্রজার দ্বারা পরিচালিত তন্ত্র অর্থাৎ প্রত্যেক নাগরিকের দ্বারা পরিচালিত শাসনতন্ত্র। গণতন্ত্রের মূল লক্ষ্য হলো সরকারের যাবতীয় সিদ্ধান্ত নাগরিকবৃন্দের ইচ্ছানুসারে নেওয়া। সেই লক্ষ্য পূরণ করার উদ্দেশ্যেই নির্বাচন বিধি ও গণতান্ত্রিক অন্যান্য পরিকাঠামো ও নিয়ম সমূহ গঠিত ও নির্মিত হয়েছে। সংবিধান রচনার মূল উদ্দেশ্যও তাই।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ভারতীয় গণতন্ত্রের সেই মূল উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি সর্বতোভাবে। জনারণ্যে কান পাতলেই তাই শোনা যায় রাষ্ট্রের নানা সিদ্ধান্ত নিয়ে জনমানসের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ এবং রাষ্ট্রনায়কদের নানান কীর্তি নিয়ে তাদের প্রবল ক্রোধ-উদগীরণ। অথচ এই রাষ্ট্রনায়করা তাদেরই দ্বারা নির্বাচিত, সংবিধান অনুসারে এই রাষ্ট্র তাদেরই দ্বারা চালিত। অতএব একথা অনস্বীকার্য যে লক্ষ্য আর বাস্তবের মধ্যে, প্রজা আর প্রজার দ্বারা পরিচালিত শাসনতন্ত্রের মধ্যে ব্যবধান বিস্তর। এই ব্যবধান কী এবং তার উৎপত্তি কোথায় তা বর্তমান প্রবন্ধের মূল আলোচ্যবস্তু।

আমাদের গণতন্ত্র হলো পরোক্ষ গণতন্ত্র অর্থাৎ জনসাধারণ বা ভোটদাতারা ভোটের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে পাঠায় আইনসভায় (বিধানসভা ও লোকসভা)। আইনসভার সেই সদস্যবৃন্দ আবার সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে গঠন করে সরকার। সেই সরকার (কেন্দ্রে বা রাজ্যে) নির্দিষ্ট কালখণ্ড ধরে (সর্বাধিক ৫ বছর) পরিচালনা করে রাষ্ট্রকে বা রাজ্যকে। নির্দিষ্ট কালখণ্ডের মধ্যে সরকারের কাজকর্ম আশানুরূপ না হলে অনাস্থার মাধ্যমে তা ভেঙে দিতে পারেন আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য। অর্থাৎ একবার নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পরে পরবর্তী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপরিচালনা ব্যাপারে ভোটদাতার কোনো ভূমিকা থাকে না। এই অন্তবর্তী সময়ে আইনসভার সদস্যদের অর্থাৎ ভোটদাতা কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বক্তব্যই ভোটদাতাদের বক্তব্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

সমস্যার সূত্রপাত সেখানেই। আইনসভার আলোচ্য যে কোনো ব্যাপারে ভোটদাতাদের ইচ্ছে কী তা জানার কোনো চেষ্টা না করেই (বা জেনেও উপেক্ষা করেই) আইনসভার সদস্যবৃন্দ নিজেদের ইচ্ছে প্রকাশ করেন। ফলে তা প্রায়ই ভোটদাতার ইচ্ছের অনুরূপ হয় না। তখন প্রজা ও তন্ত্রের ব্যবধান প্রকট হয়।

আমাদের গণতন্ত্রের পরিকাঠামো ইংলন্ডের থেকে ধার করা। তাই ইংলন্ডীয় গণতন্ত্রের যাবতীয় অপূর্ণতা এর মধ্যে বর্তমান। কিন্তু অন্যান্য দেশের গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর দিকে চোখ ফেরালে দেখা যাবে সেখানেও এই সমস্যা বর্তমান। গণতন্ত্রের আমেরিকান মডেল অর্থাৎ প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বা সরাসরি রাষ্ট্রনায়ক নির্বাচনের কথা বিবেচনায় আনলে দেখা যাবে সেখানেও নির্বাচিত রাষ্ট্রনায়ক তাঁর নিজের ইচ্ছের দ্বারা জনগণের ইচ্ছেকে প্রতিস্থাপিত করতে পারেন। অবশ্য হাতির মাথায় অঙ্কুশের মতো সেখানে সেনেটরবৃন্দ এবং তাদের 'ইমপিচমেন্টের' ক্ষমতা বিদ্যমান। কিন্তু সেই ক্ষমতা

প্রয়োগের অধিকারও সেনেটরদের (আমাদের আইনসভার প্রতিনিধিদের অনুরূপ) হাতে। সেনেটরদের নির্বাচনকারী জনগণের সেখানে কোনো ভূমিকা থাকে না। অর্থাৎ সেখানেও প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে পরোক্ষের পরোক্ষ ছায়া পড়ে এবং প্রজা ও তন্ত্রের ফারাক সেখানেও স্পষ্ট হয়।

অতএব একথা অনস্বীকার্য পৃথিবীতে বর্তমানে প্রচলিত কোনো গণতান্ত্রিক কাঠামোতেই সরাসরি প্রজার ইচ্ছা শাসনতন্ত্রের কাজে প্রতিফলিত হয় না। একবার জনপ্রতিনিধি বা রাষ্ট্র পরিচালক নির্বাচনের পরে প্রজার হাতে ক্ষমতা থাকে শুধু পরবর্তী নির্বাচন অর্থাৎ পরবর্তী নির্বাচনে বর্তমান জনপ্রতিনিধিকে বিচারের ক্ষমতা (যদি তিনি সেবারেও ভোটপ্রার্থী হন তবেই)। কিন্তু সেখানেও ঘটনা ও সময়ের প্রভাবে সর্বদা ন্যায়বিচার সম্ভব হয় না। উদাহরণ সহযোগে দেখা যাক। ধরা যাক কোনো একজন জনপ্রতিনিধি বা রাষ্ট্রনায়ক রামবাবু নিজের নির্দিষ্ট কালখণ্ডের মধ্যে দশটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বা আইনসভায় ভোট দিয়েছেন। সেই দশটির মধ্যে সাতটি বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত বা ভোটের অভিমুখ ভোটদাতাদের ইচ্ছানুসারী হয়েছে এবং বাকি তিনটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত বা ভোটের অভিমুখ ভোটদাতাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয়েছে। পরবর্তী নির্বাচনের সময়ে ভোটদাতাগণ মন্দের ভাল হিসেবে তাঁকেই পরবর্তী প্রতিনিধি নির্বাচন করল যেহেতু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্ত ভোটদাতাদের অনুরূপ। এক্ষেত্রে ঘটনার প্রভাবে ন্যায়বিচার সম্পূর্ণ হলো না, কারণ সংবিধানের লক্ষ্য ছিল এমন প্রজাতন্ত্র নির্মাণ করা যেখানে দশটির মধ্যে দশটি সিদ্ধান্তই ভোটদাতাদের মতানুসারী হয়। আবার ধরা যাক, কোনো একজন জনপ্রতিনিধি বা রাষ্ট্রনায়ক শ্যামবাবু নিজের নির্দিষ্ট কালখণ্ডের প্রথম দিকে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নিজের ইচ্ছানুসারে এবং ভোটদাতাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়েছেন এবং কালখণ্ডের শেষ দিকে যাবতীয় সিদ্ধান্ত ভোটদাতাদের ইচ্ছানুসারে নিয়েছেন। পরবর্তী নির্বাচনের সময়ে নবীনতর সিদ্ধান্তসমূহের স্মৃতিতে বিভোর ভোটদাতাগণ তাঁকেই পুনর্নির্বাচন করল। এক্ষেত্রে সময়ের প্রভাবে ন্যায়বিচার সম্পূর্ণ হলো না। কারণ সংবিধানের লক্ষ্য ছিল এমন প্রজাতন্ত্র নির্মাণ করা যেখানে কালখণ্ডের মধ্যে গৃহীত সব সিদ্ধান্তই ভোটদাতাদের মতানুসারী হয়।

এই মৌলিক বিচ্যুতি ছাড়াও ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের আরও নানা ত্রুটি বর্তমান। প্রথমত, প্রশাসনের পক্ষপাতদুষ্টতা প্রজাতন্ত্র অনুশীলনের প্রাথমিক শর্ত নিরপেক্ষতার ও স্বাধীনতার ব্যাঘাত ঘটায়। দ্বিতীয়ত, প্রজাতন্ত্র কর্তৃক গঠিত আইনসভা সমগ্র দেশ বা রাজ্যের নিয়ন্ত্রণকারী হলেও নির্বাচিত প্রতিনিধিসমূহ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিজের অঞ্চলের কথা চিন্তা করেই আইনসভার অবস্থান নেন তাতে সামগ্রিক সিদ্ধান্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তৃতীয়ত, শিক্ষাব্যবস্থা যা জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে সমগ্র দেশ থেকে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করে তা প্রজাতন্ত্র অনুসারে আইনসভার নিয়ন্ত্রণাধীন। আইনসভার সদস্যবৃন্দ এবং তাদের নির্বাচকমণ্ডলী সকলে শিক্ষার গুরুত্ব এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্পর্কে সমান অবহিত নন। শিক্ষাব্যবস্থা তাৎক্ষণিক ফল প্রদানেও অক্ষম, তাই শিক্ষাব্যবস্থা প্রজাতন্ত্রের হাতে প্রায়ই অনাদৃত হয় (অবশ্য একথা অনস্বীকার্য রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র ইত্যাদি অন্য ধরনের শাসনব্যবস্থাও শিক্ষাব্যবস্থাকে সমান বা বেশি অনাদরে অভ্যস্ত)। চতুর্থত, ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে আইনসভা ও নাগরিক পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহ গঠনপ্রণালী অনুযায়ী পৃথক, কিন্তু ভোটপ্রার্থীদের কুটিলতায় ও ভোটদাতাদের সরলতায় (বা অজ্ঞতার) প্রায়ই এই পৃথকীকরণের সীমারেখা নির্বাচনকালে অদৃশ্য হয়ে যায়, যা প্রজাতন্ত্রের মৌলিক পরিকল্পনায় আঘাত করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পৃথিবীর অন্যান্য গণতন্ত্রেও এই ত্রুটিসমূহ বিভিন্নাকারে বর্তমান (ইংলন্ডে মার্গারেট থ্যাচারের আমলে সরকার ও অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির দ্বন্দ্ব এই জাতীয় ত্রুটিরই বহিঃপ্রকাশ)।

অতএব দেখা যাচ্ছে মানবসভ্যতার যাবতীয় সমস্যার সমাধানকল্পে বিশ্বজুড়ে দেশে দেশে সাদরে গৃহীত প্রজাতন্ত্র তার মূল নীতি থেকে বিচ্যুত হয়েছে। সমস্যা জটিল কিন্তু সমাধান কী? যুগ যুগ ধরে মানবসভ্যতার যাবতীয় সমস্যার সমাধানদাতা দেশ ভারতবর্ষ। তাই এবারেও ভারতবর্ষ থেকেই সমাধানের সন্ধান আরম্ভ করা যাক। ভারতের বর্তমান গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর সঙ্গে কিছু সংযোজন-বিয়োজন অর্থাৎ সংশোধন করে সমাধানে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা যাক।

প্রথম সংশোধন : আইনসভায় গৃহীত হতে চলা সম্ভাব্য সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে যেগুলির দ্বারা প্রভাবিত অর্থসম্পদের পরিমাণ সাধারণ নির্বাচনের ১০ গুণ বা তার বেশি (যেমন কেন্দ্রের ক্ষেত্রে স্পেকট্রাম বণ্টন, কয়লা খনি বণ্টন ইত্যাদি সিদ্ধান্ত), সেগুলির ওপর স্তর অনুযায়ী দেশব্যাপী বা রাজ্যব্যাপী গণভোট নেওয়া হোক এবং সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক। অর্থাৎ আইনসভার সদস্যদের ইচ্ছার বদলে সরাসরি ভোটদাতাদের ইচ্ছাকে সম্মান জানানো হোক।

দ্বিতীয় সংশোধন : অপেক্ষাকৃত কম অর্থসম্পদকে প্রভাবিত করা ,সম্ভাব্য সিদ্ধান্তসমূহের একটি তালিকা আইনসভা (লোকসভা বা বিধানসভা) নির্বাচনের আগে প্রস্তুত করা হোক। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি ভোটপ্রার্থীকে দিয়ে সেই তালিকার প্রতিটি সম্ভাব্য সিদ্ধান্তে তিনি আইনসভার সদস্য হিসাবে কী অবস্থান নেবেন তা অঙ্গীকার করানো হোক। নির্বাচন পরবর্তীকালে আইনসভার সদস্য হিসেবে তিনি ভিন্নমত অবলম্বন করলে তৎক্ষণাৎ তাঁর আইনসভার সদস্য পদ বাতিল করে সেইস্থানে পুনরায় নির্বাচনের দ্বারা দ্বিতীয় সদস্য নিয়োগ করা

হোক। এবং সেই নির্বাচনে সেই বাতিল সদস্যের অংশগ্রহণের অধিকার বন্ধ হোক (বাতিল সদস্যের পুনরায় ভোটপ্রার্থী হবার অধিকার থাকলে ব্যাপরটা 'কল্-ব্যাক্'-এর মতো দাঁড়াবে এবং সেখানে ঘটনা ও সময়ের প্রভাবে ন্যায়বিচার অসম্ভব হতে পারে)। নতুন নির্বাচন ও পূর্বের ন্যায় সম্ভাব্য তালিকা ও অঙ্গীকারের মাধ্যমে হোক।

তৃতীয় সংশোধন : আইনসভার নির্বাচনের প্রচারে নাগরিক পরিষেবার প্রতিশ্রুতি প্রদান নির্বাচনী আইন অনুযায়ী নিষিদ্ধ হোক।

চতুর্থ সংশোধন : গণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্রের তিনটি স্তম্ভ বর্তমান আইন, বিচার ও শাসন। এই তিনটি স্তম্ভের পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকা উচিত। বর্তমানে আইন ও শাসন এই দুটি স্তম্ভ আইনসভার হাতে আছে (আইন আইনসভায় প্রণীত হয় ও শাসন আমলাতন্ত্রের দ্বারা চালিত হয়, যে আমলাতন্ত্র আইনসভা দ্বারা নির্বাচিত সরকার দ্বারা চালিত হয়) এবং বিচারব্যবস্থা পৃথক স্বশাসিত আছে। সংবিধান সংশোধনের দ্বারা আইন, বিচার ও শাসন প্রত্যেকটিই পৃথক অধিকারে থাকা উচিত। আইন আইনসভার আয়ত্তে (বর্তমানের মতো), বিচার বিচারব্যবস্থার আয়ত্তে (বর্তমানের মতো) ও শাসন সুশাসিত আমলাতন্ত্রের আয়ত্তে (বিচারব্যবস্থার মতো তারও পৃথক নিয়োগ ও পদোন্নতির ব্যবস্থা থাকবে) থাকা উচিত। এতে শাসনব্যবস্থা অর্থাৎ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা বজায় থাকবে যে নিরপেক্ষতা আমরা এযাবৎকাল বিচারব্যবস্থার কাছ থেকে পেয়ে এসেছি।

পঞ্চম সংশোধন : বর্তমান ব্যবস্থামতো দ্বি-স্তরীয় নির্বাচন আইনসভা (কেন্দ্রে লোকসভা, রাজ্যে বিধানসভা) ছাড়াও একটি তৃতীয় স্তরের ক্ষুদ্র আইনসভা থাকা দরকার, যা জেলাস্তরীয় হবে। অনেক ক্ষুদ্র ও অতি আঞ্চলিক বিষয় লোকসভা ও বিধানসভার সময় নষ্ট না করে এই তৃতীয় স্তরের আইনসভার বির্তর্কের বিষয় হবে। এই আইনসভাতেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে প্রথম ও দ্বিতীয় সংশোধনের অনুরূপ নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

ষষ্ঠ সংশোধন : নির্বাচনের সংখ্যা এবং বৈচিত্র্য বাড়ার ফলে নির্বাচন কমিশনের অধীনে স্থায়ী কর্মী রাখা হোক যারা বিভিন্ন সময়ে ঘটে চলা নির্বাচনসমূহ পরিচালনা করবে। এতে স্থায়ী খরচ হয়তো বাড়বে কিন্তু সরকারি বা রাষ্ট্রায়ত্ত বা রাষ্ট্রঘোষিত কর্মীদের তাদের কাজ থেকে তুলে নিয়ে কর্মদিবস নষ্টের সংস্কৃতি বন্ধ হবে। এবং পক্ষপাতদৃষ্ট পোস্টাল ভোটের অবলুপ্তি ঘটিয়ে ভোটদান ব্যবস্থাকে নিরপেক্ষ করবে।

সপ্তম সংশোধন : নাগরিক পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের নির্বাচনও স্বশাসিত নির্বাচন কমিশনের অধীনে হোক এবং সেখানেও প্রথম ও দ্বিতীয় সংশোধন অনুসারে নির্বাচন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ হোক।

অষ্টম সংশোধন : রাষ্ট্রপতি আইনসভার সদস্যবৃন্দ কর্তৃক নির্বাচিত না হয়ে সরাসরি গণভোটের দ্বারা নির্বাচিত হন (আমেরিকার মতো) এবং তাঁর হাতে অর্থ, প্রতিরক্ষা ও বিদেশমন্ত্রক থাক (চতুর্থ সংশোধন অনুযায়ী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক আর আইনসভা বা সরকারের আয়ত্তে থাকছে না)। বাকি মন্ত্রকসমূহ এখনকার মতো প্রধানমন্ত্রীর হাতেই থাক। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিও প্রথম ও দ্বিতীয় সংশোধনের মতো রাশের আওতায় থাকবেন। রাজ্যপালও মনোনীত না হয়ে রাজ্যবাসীর গণভোটে নির্বাচিত হন। এক্ষেত্রে তাঁর হাতে অর্থমন্ত্রক থাকবে এবং তা প্রথম ও দ্বিতীয় সংশোধন মেনে।

নবম সংশোধন : শিক্ষা পরিষদ নামক একটি সভা নানা সরকারপোষিত (বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বোর্ড ইত্যাদি) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বানুসারী প্রতিনিধিসমূহের দ্বারা (অর্থাৎ সমান ভোটাধিকার নয়, উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, খড়্গপুর আই আই টি'র দশটি ভোট, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ভোট) কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরে গঠিত হোক। এখান থেকে সংস্থাগুলির অর্থনৈতিক বরাদ্দ মঞ্জুর হোক প্রতিনিধিদের ভোটদানের দ্বারা। এর ফলে শিক্ষামন্ত্রকের আলাদা অস্তিত্ব আইনসভা বা সরকারের আয়ত্তে না থাকার ফলে সরকার কর্তৃক শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার সম্ভাবনা লোপ পাবে। এই পরিষদে বিশেষ যোগ্যতাবলে কোনো কোনো সদস্য মনোনীত ও ভোটদানের অধিকারী হবেন। যেমন নোবেল প্রাপক, বিজ্ঞান ও প্রতিরক্ষা গবেষণায় বিশেষ অবদানকারী ইত্যাদি। এই পরিষদের সদস্যদেরই শুধু স্বাধীন ভোটাধিকার থাকবে, অর্থাৎ এই পরিষদের সিদ্ধান্ত গণভোটের মুখাপেক্ষী থাকবে না। অবশ্য শিক্ষাপরিষদ মোট কত অর্থসম্পদের বিলিবণ্টনের অধিকারী হবে তা গণভোটের দ্বারা রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল স্থির করবেন।

দশম সংশোধন : সরকার শোষিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির সেনেট সেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের দ্বারা নির্বাচিত সেনেটের দ্বারা গঠিত হোক। যেমন— বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে উত্তীর্ণ স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও সেখানকার অধ্যাপক ও গবেষকসমূহের দ্বারা গুরুত্বানুযায়ী ভোটের দ্বারা (সকলের ভোটাধিকার সমান নয়, উদাহরণস্বরূপ বলা যায় স্নাতকের একটি ভোট, স্নাতকোত্তরের দুটি ভোট, দুটি স্নাতকোত্তরের চারটি ভোট, অধ্যাপকের পাঁচটি ভোট ইত্যাদি নানারকম গুরুত্বানুযায়ী) নির্বাচিত হবে। সেনেটের নির্বাচন ও শিক্ষা পরিষদের সদস্য নির্বাচন স্বশাসিত নির্বাচন কমিশনের অধীনেই হবে। সেনেটের নির্বাচন প্রথম ও দ্বিতীয় সংশোধন অনুযায়ী হবে।

এই সংশোধনসমূহের দ্বারা সমৃদ্ধ ভারতীয় গণতন্ত্র তার ত্রুটিগুলি দূর করে গোটা বিশ্বের পথ প্রদর্শনকারী হতে পারবে নিঃসন্দেহে। ■

এন জে এ সি অ্যাক্ট কি সংবিধানের মূল ভাবনাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে?

সমীর পাল

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ন্যাশনাল জুডিশিয়াল অ্যাপোয়েন্টমেন্ট কমিশন বিল-২০১৪ সংবিধানের ৯৯তম সংশোধনের মাধ্যমে লোকসভায় পাশ করায় ১৩ আগস্ট ২০১৪ সালে এবং রাজ্যসভায় পাশ করায় ১৪ আগস্ট ২০১৪ সালে। ভারতের রাষ্ট্রপতি ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ সালে ওই বিলে সম্মতি দেবার সঙ্গে সঙ্গে ন্যাশনাল জুডিশিয়াল অ্যাপোয়েন্টমেন্ট কমিশন অ্যাক্ট-২০১৪ আইনে পরিণত হয় এবং ওই তারিখেই রিঅ্যাক্টটি সরকারি গেজেট ভুক্ত হয়। ১৩ এপ্রিল ২০১৫ সাল ওই আইনটি সক্রিয় ভাবে কার্যকরী হয়। এই আইনটি প্রণয়নের পেছনে সরকারের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের উচ্চতম আদালত এবং উচ্চতর আদালতগুলির বিচারপতি নিয়োগ এবং ট্রান্সফার করার জন্য এতদিন যে কলেজিয়াম পদ্ধতি চালু ছিল অর্থাৎ সিদ্ধান্ত নেবার জন্য কাঠামো ছিল যার মধ্যে ছিলেন প্রধান বিচারপতি, চারজন শীর্ষ আদালতে অধিষ্ঠিত বিচারপতি এবং উচ্চতর আদালতের ৩ জন বিচারপতি ও সেই উচ্চতর আদালতের প্রধান বিচারপতি। এই আইনের বলে তার অবসান করা হয়েছিল। আইন দপ্তরের ঘোষিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল যে এই আইন অর্থাৎ ন্যাশনাল জুডিশিয়াল অ্যাপোয়েন্টমেন্ট কমিশন আইন-২০১৫ একটি স্বচ্ছ এবং উন্নত পদ্ধতিতে বিচারপতি মনোনয়ন করার জন্য কলেজিয়াম বাতিল করে ন্যাশনাল জুডিশিয়াল অ্যাপোয়েন্টমেন্ট কমিটি কাজ করবে। যার অধীনে থাকবেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, সুপ্রিম কোর্টের দু'জন সিনিয়র বিচারপতি, আইনমন্ত্রী ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির মনোনীত একজন ব্যক্তি ও লোকসভার বিরোধী দলনেতা।

> **এটাও সত্য, সংবিধানের মূল আধারকে অতিক্রম করে, সংসদের আইন তৈরি করার ক্ষমতা থাকা উচিত নয়। কিন্তু 'বিচারপতি দ্বারা বিচারপতি' নিয়োগের আইন বাতিল করে নতুন আইন আনলেই এই অভিযোগ করা যায় কিনা এটাই আজ আলোচনার বিষয়।**

কলেজিয়াম পদ্ধতিকে বলা যেতে পারে বিচারপতিরাই বিচারপতি নিয়োগ করবেন। দিল্লী হাইকোর্ট ভূতপূর্ব কলেজিয়ামের নামকরণ করলেন এই বলে যে 'আঙ্কল অ্যান্ড সন্ সিন্ড্রোম'। সরকারের আনা লোকসভা ও রাজ্যসভায় পাশ হওয়া এই আইনকে চ্যালেঞ্জ জানানো হলো এই বলে যে সরকারের এক্সিকিউটিভ বডির কোনো এক্তিয়ার নেই কলেজিয়ামকে প্রভাবিত করার। কারণ তাতে জুডিশিয়ারিকে নিরপেক্ষ রাখা যায় না। বিচারবিভাগ

স্বাধীনভাবে চলতে পারবে না বলে মনে করা হলো। কারণ হিসাবে বলা হলো যে এন জে এ সি-তে আইনমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর মনোনীত ব্যক্তি থাকার অর্থই হলো এক্সিকিউটিভ বডি বিচার বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং বিচারবিভাগ আর স্বাধীন থাকবে না। এই আইন পাশ করিয়ে আনার পেছনে যেমন বিচারপতি নিয়োগ এবং ট্রান্সফারের বিষয়ে স্বচ্ছতা আনার চেষ্টা করার কথা ভাবা হচ্ছে তেমনি কলেজিয়ামের সীমাবদ্ধতার কথা ভাবা হয়েছে। সংসদের দুই কক্ষের পাশ হয়ে যাওয়া এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাওয়া আইনকে এইভাবে চ্যালেঞ্জ করাকে সংসদ সদস্যদের যারপরনাই অসন্তুষ্ট করেছে। তাঁরা বলেও ফেলেছেন যে সাংসদরা বেতন বৃদ্ধির জন্য আনা বিলকে পাশ করালে সেটা যদি সমালোচনার মধ্যে পড়ে তবে বিচারপতিরাই বিচারপতি নিয়োগ করবে, সেখানে বিচারপতি ছাড়া আর কেউ থাকবে না— সেটাই বা কেন সমালোচনার মধ্যে পড়বে না? সংসদ বিল/আইন পাশ করাবে এটাই নিয়ম। সেই আইন অবশ্যই ভারতের সংবিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। সংবিধানের মৌলিক অধিকারগুলিকে খর্ব করে অবশ্যই নয়।

সুপ্রিম কোর্ট আবার কলেজিয়ামকে ফিরিয়ে আনার সঙ্গে সঙ্গে সাংসদরা প্রশ্ন করতে শুরু করেছেন যে সংবিধানের মৌলিক বিষয় যদি হয়ে থাকে 'নিরপেক্ষতা' তবে বিচারপতির দ্বারা বিচারপতির নির্বাচন/মনোনয়ন অবশ্যই কলেজিয়ামকে নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন করে তোলে। সুপ্রিম কোর্ট প্রশ্ন তুলেছে এই ভাবে আইন পাশ করে কলেজিয়ামকে বাতিল করা এবং এন জে এ সি অ্যাক্ট ২০১৫-কে লাগু করা সংবিধানের মৌলিক আধারকে খর্ব করার চেষ্টা হয়েছে। এই অধিকার সংসদকে দেওয়া হয়নি। আবার সুপ্রিম কোর্ট এও স্বীকার করেছে যে কলেজিয়ামে স্বচ্ছতার অভাব আছে কিন্তু সেটা এন জে এ সি-র থেকে অনেক ভাল। সাংসদরা ভাবতে শুরু করেছেন যে সুপ্রিম কোর্ট কি বিচারপতি নিয়োগে ও স্থানান্তরের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার অভাব দেখতে পাচ্ছেন না? যদি পান তবে এন জে এ সি-কে লক্ষ্য না করে নিরপেক্ষতার নিরিখে বিচারপতি নিয়োগে সংসদকে পরামর্শ দিতে পারে। কিন্তু কলেজিয়ামকে ফিরিয়ে আনাই যেন একমাত্র লক্ষ্য না হয়। প্রসঙ্গত আলোচ্য, সংসদ সদস্যদের মধ্যে এও ধারণা হয়েছে যে সংসদের পাশ হয়ে যাওয়া আইনের উপর এইভাবে লাগাম ধরে রাখা বিশেষত যেখানে বিচারপতি নিয়োগ ও স্থানান্তরের মতো বিষয় জড়িত, বিচার বিভাগের একনায়কতন্ত্র বলে কেউ কেউ মনে করছেন। এক্সিকিউটিভ বা লেজিসলেটিভ বিভাগের ভূমিকাকে এভাবে খর্ব করে দেওয়াকে বিচার বিভাগের একনায়কতন্ত্র বলেই মনে করা হচ্ছে। সংসদে আইন পাশ হয়— সাংসদরা আইন ভালই জানেন বলে মনে করা হয়ে থাকে। এই জায়গাটা সামনে এসে গেছে অর্থাৎ জনগণ জেনে যাচ্ছেন যে সংসদ তার ক্ষমতা অতিক্রম করে সংবিধানের মূল বিষয়কে ছাপিয়ে গিয়ে আইন এনে ফেলেছেন। এভাবে সুপ্রিম কোর্ট ব্যাখ্যা করবেন— এটা সংসদ ভাবতে পারেনি। কিন্তু এটাও সত্য সংবিধানের মূল আধারকে অতিক্রম করে, সংসদের আইন তৈরি করার ক্ষমতা থাকা উচিত নয়। কিন্তু 'বিচারপতি দ্বারা বিচারপতি' নিয়োগের আইন বাতিল করে নতুন আইন আনলেই এই অভিযোগ করা যায় কিনা এটাই আজ আলোচনার বিষয়। এইজন্য এই বিষয়ে সবাইকে যেমন বার কাউন্সিল, সর্বভারতীয় বার কাউন্সিল, বার অ্যাসোসিয়েশন এবং প্রেস কাউন্সিল-এর মতো সংগঠন বা সংস্থাগুলিকে বলতে দেওয়া উচিত অর্থাৎ এদেরও অভিমত নেওয়া দরকার।

(লেখক একজন আইনজীবী)

কোটিপতি হোন!
নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন
মিউচুয়াল ফাণ্ডে SIP করুন
১০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৩ পর্যন্ত
SIP-তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন তাদের প্রত্যেকের
ফান্ড ভ্যালু বর্তমানে ৩২ লাখ টাকা।
যোগাযোগ ঃ দেবাশিষ দীর্ঘাঙ্গী, শুভাশিষ দীর্ঘাঙ্গী
DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
9830372090
9433359382
মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :-

ASHOKA TOOLS PVT. LTD.

MECHANICAL & STRUCTURAL ENGINEERS

-: REGD. OFFICE :-

23A, Netaji Subhas Road,

11 th Floor, Room No. 31,

Kolkata-700 001

-: FACTORY :-

95/1/3-B, Cossipore Road,

Kolkata - 700 002

PHONE : OFFICE : 2231-9166/

FAX NO : (033) 2231-9166,

Factory : 2557-2881

With the best Compliments from :

JALAN CHEMICAL & INDUSTRIES PVT. LTD.

Director : Rajesh Jain

27AB Royd Street, Ground Floor

Kolkata-700016

Phone : 22297263

সংবিধানের দ্বিমুখিতা এবং আমাদের রাজনৈতিক নেতারা

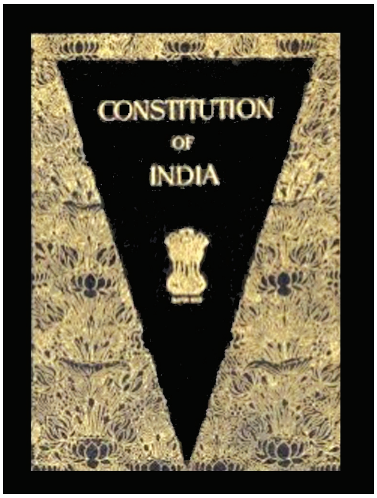

তারক সাহা

সংবিধান প্রতি দেশের কাছেই মর্যাদাপূর্ণ। আমাদের দেশের সংবিধান পুস্তকের দুই মলাটের মধ্যে সীমাবদ্ধ। পৃথিবীর বহু দেশের সংবিধান লিখিত নয়। আমাদের দেশের সংবিধান ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি স্বাধীন ভারতে গৃহীত হয় এবং দুনিয়ায় ভারতবর্ষ একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক, প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। দেশের প্রতিটি নাগরিক ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সংবিধানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে এমনটাই দস্তুর। এমন নির্দেশ দেওয়া আছে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫১ (এ)-তে। এতে বলা হয়েছে :

It shall be duty of every citizen of India—

(a) to abide by the constitution and respect its ideals and institutions, the National Flage and National Anthem. অর্থাৎ দেশের প্রতিটি নাগরিক সংবিধানে বর্ণিত নির্দেশ মেনে চলবে, সাংবিধানিক আদর্শ এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান-সহ জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীতকে মর্যাদা দেবে। রাষ্ট্র যেমন তার সাংবিধানিক দায় বহন করে চলবে তেমনি প্রতিটি নাগরিকও তার সাংবিধানিক কর্তব্য মেনে চলবে।

কিন্তু সর্বদা এমনটা মেনে চলা হয় না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, সংবিধানে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে অনুচ্ছেদ ১৫ (২)-তে যে, The state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, Caste, Sex, place of birth or any of them. অর্থাৎ রাষ্ট্র কখনওই কোনো নাগরিককে তার ধর্ম, জাতি, সম্প্রদায়, লিঙ্গ প্রভৃতি বিষয়ে অবিচার করবে না। কিন্তু সেই সঙ্গে জাত-পাতের ভিত্তিতে সরকারি চাকরি, শিক্ষায় তপশিলি জাতি, উপজাতির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ ব্যবস্থাও সংবিধান স্বীকৃত হলো। সংবিধান প্রণেতারা অবশ্য এই ব্যবস্থা দশ বছরের জন্য চালু রাখার ব্যবস্থা করলেও দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে প্রায় সাত দশক অতিক্রান্ত হবার পরেও বহাল তবিয়তে সেই ব্যবস্থা চালু রয়েছে এবং রাজনৈতিক দলগুলির স্বার্থে তা অনির্দিষ্টকালের জন্য বহাল থাকবে। বরং উত্তরোত্তর এর সীমানা বেড়েই চলেছে। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে এই ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হচ্ছে সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রেও। অথচ বিভিন্ন মহল থেকে দাবি উঠছে এই ব্যবস্থা অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার ক্ষেত্রে চালু হোক। এতে সংবিধানের মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত হবে এবং জাত, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সংরক্ষণের সুবিধা পৌঁছে দেওয়া যাবে।

দ্বিতীয় ক্ষেত্র হলো, দেশের নাগরিকদের জন্য সমান দেওয়ানি বিধি চালু করার কথা বলা হয়েছে সংবিধানের ৪৪ নং অনুচ্ছেদে। যেহেতু বিষয়টা রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে নির্দেশাত্মক নীতি (Directive Principle of State Policy) অধ্যায়ে রয়েছে, তাই রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বিষয়টার মান্যতা বাধ্যতামূলক নয়। মজার ব্যাপার হলো, সকল নাগরিকের জন্য ফৌজদারি বিধি সমান হলেও দেওয়ানি বিধি সমান নয়। এতে বলা হলো, The State shall endeavour to Secure for the citizen a uniform civil code throughout India. অর্থাৎ রাষ্ট্র দেশের সকল নাগরিকের জন্য অভিন্ন দেওয়ানি বিধি শুরু করবে। অথচ বাস্তবে এমনটা হলো না। আটের দশকের মাঝামাঝি সুপ্রিম কোর্ট শাহবানু মামলায় অভিন্ন দেওয়ানি বিধির নীতিকে মান্যতা দিয়ে বিবাহবিচ্ছেদ মামলায় শাহবানুর স্বামীকে খোরপোশ দিতে বলায় দেশজুড়ে হৈচৈ শুরু করে দেয় সংখ্যালঘুরা। তারই চাপে পড়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী সংবিধান সংশোধন করে সুপ্রিম কোর্টের সেই নির্দেশ বাতিল করেন।

তৃতীয় ক্ষেত্র হলো, দেশজুড়ে সম্প্রতিকালে অসহিষ্ণুতার কথা বলা হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশে দাদরিতে গো-হত্যার জন্য এক সংখ্যালঘু মানুষের প্রাণ যায়। ঘটনা নিন্দনীয়। যে কোনো হত্যাই অপরাধ। কিন্তু গো-সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে সংবিধানের ৪৮ নং অনুচ্ছেদে। তাতে বলা হয়েছে— The state shall endearou to organise agriculture and animal husbandry an modern of scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and imporving the breeds, and prohibiting the slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle.

অর্থাৎ রাষ্ট্র আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ-আবাদ এবং পশুপালন করবে, বিশেষত গাভী ও বাছুরের সংরক্ষণ এবং যত্ন নেবে। সেই সঙ্গে নজর রাখতে হবে যে, দুগ্ধবতী গাভী যেন হত্যা না করা হয়। কিন্তু বাস্তবে এমনটা হয় না। এই প্রতিবেদকের অভিজ্ঞতা হলো এক বিশেষ সম্প্রদায়ের 'কুরবানি' উৎসবে দুগ্ধবতী গাভী-সহ বাছুর হত্যা করা হয়ে থাকে। কেননা তাদের কাছে দুগ্ধবতী গাভী এবং বাছুরের মাংস নাকি বলদ বা

ষাঁড়ের মাংস থেকে সুস্বাদু এবং দুগ্ধবতী যুবতী গাভীর চামড়া অনেক বেশি মূল্যবান।

এদিকে সংবিধান যখন গো-হত্যাকে স্বীকৃতি দেয় না, অথচ গো-হত্যার বিরুদ্ধে আন্দোলন করলেই কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ অসহিষ্ণুতা, অসহিষ্ণুতা বলে চিৎকার করছে। অথচ সংবিধানে স্বীকৃতি না থাকলেও ছদ্ম-ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীদের অনেকই এই ইস্যুতেই তাঁদের প্রাপ্ত খেতাব ত্যাগ করেছেন। সুতরাং সংবিধানে গো-হত্যা নিষেধ থাকলেও আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতারা এর বিরুদ্ধে সরব হন সস্তা রাজনীতির লক্ষ্যে।

পঞ্চমত, আমাদের গণতন্ত্র যে তিনটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে তার মধ্যে রয়েছে ‘বিচার ব্যবস্থা’। ভারতবর্ষে বলা হয়ে থাকে ‘বিচার ব্যবস্থা’ নিরপেক্ষ। কিন্তু ইদানীং দেখা যাচ্ছে যে, শাসকদল প্রায়ই বিচারকের রায় উপেক্ষা করছে। আসলে বিচারকদের সীমা হলো নির্দেশ দেওয়া আর তার রূপায়ণ করবে প্রশাসন। এ রাজ্যে ইদানীং এরকম আদালত অবমাননার কাজ হামেশাই হচ্ছে। জমি দখলের এক মামলায় রাজ্যের উচ্চতম ন্যায়ালয় উষ্মা প্রকাশ করে বলেছে যে, রাজ্য প্রশাসন যদি আদালতের রায় প্রয়োগ করতে অপারগ হয় তবে আদালত বাধ্য হবে ওই নির্দেশ সেনাবাহিনীকে দিতে। অনেক সময়ে দেখা যাচ্ছে, আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক মদতপুষ্ট অপরাধীকে পুলিশ ধরতে পারে না। শুধু তাই নয়, অতি সম্প্রতি বিচারপতি নিয়োগের মামলায় দেশের শীর্ষ আদালতের রায় মানতে চায়নি কেন্দ্রীয় সরকার। অর্থাৎ সরকার চায় না আদালত সংসদের ওপর খবরদারি করুক। সুতরাং সংবিধানের এই যথেচ্ছ অপপ্রয়োগ অসংবিধানিক। বিচারবিভাগ, প্রশাসন ও আইনসভা (Judiciary, Executive এবং Lagislature) —গণতন্ত্রের এই তিনটি স্তম্ভের যে পরিধি সংবিধান রচনা করে দিয়েছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তার প্রয়োগের যথাযোগ্য সীমা রচিত থাকলেও এর স্পষ্ট কোনো দিশা না থাকায় আজকাল প্রায়শই এই তিনটি স্তম্ভ নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। আজকাল এক ভয়াবহ প্রবণতা দেখা যাচ্ছে যে, আইন প্রণেতারা অনেক সময়ে টপকে যেতে চায় বিচারব্যবস্থাকে এবং অনেক সময়ে বিচার ব্যবস্থাও স্বাধীনভাবে এমন সব রায় প্রদান করছে তা নিয়ে হৈ হট্টগোল হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

কাজেই সংবিধানের মধ্যেই দ্বিমুখিতা নিহিত রয়েছে। কিন্তু তাতে অবশ্য দোষ নেই সংবিধান প্রণেতাদের। উলটে বলা যায় দিন যত এগোচ্ছে ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখতে রাজনৈতিক নেতারা নানা অপকর্মে জড়িয়ে পড়ছে। সংবিধানের ‘স্পিরিট’কে গ্রহণ না করে নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা করছে। এর ফলে লড়াই চলছে বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে আইন প্রণেতাদের। সুতরাং সংবিধানের দ্বিমুখিতা নেই, বরং এই দ্বিচারিতার ভূমিকায় রাজনীতিকরা। ■

> **দিন যত এগোচ্ছে ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখতে রাজনৈতিক নেতারা নানা অপকর্মে জড়িয়ে পড়ছে। সংবিধানের ‘স্পিরিট’কে গ্রহণ না করে নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা করছে। এর ফলে লড়াই চলছে বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে আইন প্রণেতাদের। সুতরাং সংবিধানের দ্বিমুখিতা নেই, বরং এই দ্বিচারিতার ভূমিকায় রাজনীতিকরা।**

Swachchha Bharat   Swabolombee Bharat

How to build a nice home, think of us

WE PROVIDE :-

+ Low Cost readymade Latrine (Toilet) + Low Cost House
+ Low Cost Domestic Dustbin & Domestic Biogas Plant
+ Heat & Waterproof Solution for your heated roof.

Contact

ABC ENGINEERS & SERVICES

"PARK PLAZA" Room No. 11 & 12, 71,
Park Street, Kolkata - 700 016
M : 98311 85740, 98312 72657,
Visit Our Website : www.calcuttawaterproofing.com

সবার প্রিয়
বিল্লদা ®
চানাচুর

‘বিল্লদাকুঞ্জ’
কালিকাপুর, বোলপুর, জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস থেকে ফিরে

বিনয়ভূষণ দাশ

ঐতিহাসিক মালদহ শহরের গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ২৭ থেকে ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হলো ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের ৭৬তম অধিবেশন। সমগ্র ভারত থেকে প্রায় ১১০০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন এই অধিবেশনে। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অধিবেশনের সূচনা হয়। সূচনা করেন ডেকান কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, প্রত্নতাত্ত্বিক ড. কে. পদ্মাইয়া (Dr. K. Paddayya)। তিনি ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের ৭৬ তম অধিবেশনের সভাপতিও বটে। এই ইতিহাস কংগ্রেস হলো ভারতের ঐতিহাসিক এবং ইতিহাস গবেষকদের সবচেয়ে বড় মঞ্চ। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, ঐতিহাসিক এবং ইতিহাস গবেষকদের এই প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন সময় নানা রাজনৈতিক দলের কব্জায় থাকার ফলে নিরপেক্ষ ইতিহাস গবেষণা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। একাদিক্রমে অনেক বৎসর এই প্রতিষ্ঠানটি কংগ্রেসপন্থী ঐতিহাসিকদের কুক্ষিগত ছিল। বর্তমানে সেই স্থান নিয়েছে মার্কসবাদীও। বামপন্থী ঐতিহাসিকগণ। ব্যাহত হচ্ছে নিরপেক্ষ এবং জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের ইতিহাস চর্চা এবং গবেষণা। ইতিহাসের ঘটনাবলীকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে জাতীয়তা-বিরোধী, মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে। ইতিহাসের ঘটনাবলীকে বিকৃত করা হচ্ছে।

যে ঘটনা ঘটে গেছে তা কোনো ব্যাখ্যার দ্বারা পরিবর্তন করা যায় না। ঐতিহাসিকের আদর্শ কী হওয়া উচিত 'রাজতরঙ্গিনী'র ঐতিহাসিক কল্‌হন সুন্দরভাবে তা' ব্যাখ্যা করেছেন একটি শ্লোকে; তিনি বলেছেন,

শ্লাঘ্যঃ স এব গুণবান্ রাগদ্বেষ-বহিষ্কৃতা।
ভূতার্থকথনে যস্য স্থেয়স্যের সরস্বতী।। —রাজতরঙ্গিনী, ১/৭

অর্থাৎ সেই গুণবানই শ্লাঘ্য ভূতকথনে যাঁর বাণী (অর্থাৎ সরস্বতী) স্থেয় অর্থাৎ বিচারকের মতো রাগদ্বেষ রহিত হয়। বিচারকের মতো নিরপেক্ষতার আদর্শই ঐতিহাসিকের আদর্শ হওয়া কাম্য। কিন্তু সব যুগেই এই আদর্শ অনুযায়ী চলার ক্ষেত্রে বিশেষ অন্তরায়ের সম্মুখীন হতে হয় ঐতিহাসিকদের।

ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই সত্যনিষ্ঠার ধারাকে ত্যাগ করে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের কংগ্রেসপন্থী ঐতিহাসিকগণ স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধী এবং নেহরু বংশের অবদানকে বড় করে, ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখিয়েছেন, অন্যদের অবদানকে করেছেন খাটো। মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু, মতিলাল নেহরু— এঁদের অবদানকে অতিরঞ্জিত করে দেখিয়েছেন। অন্যদিকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিনায়ক দামোদর সাভারকর, লালা লাজপত রায় প্রমুখ স্বাধীনতা সংগ্রামীর অবদানকে গুরুত্বহীন করে দেখিয়েছেন। কংগ্রেসপন্থী এই সমস্ত ঐতিহাসিকগণ 'ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসকে' কব্জা করে ফেলে। কংগ্রেসপন্থী ঐতিহাসিক ড. তারাচাঁদ, ড. বিশ্বেশ্বর প্রসাদ, ড. সৈয়দ মামুদ, মুহম্মদ হাবিব, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তি এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। ভারতের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার ব্যাপারে তাঁদের বিশেষ কোনো আগ্রহ ছিল না। একবার ইতিহাস কংগ্রেস ভারতের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার প্রস্তাব করে এবং এজন্য বই লেখার সমস্ত ভার তাদের নির্বাচিত একটি কমিটির হাতে ন্যস্ত করে। কিন্তু শেষ অবধি কাজ বেশি এগোয়নি। 'ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস' নিযুক্ত এই কমিটির সভাপতি ছিলেন ড. তারাচাঁদ। 'ইতিহাস কংগ্রেসের' কংগ্রেসপন্থী ঐতিহাসিকদের কর্মতৎপরতার এই হলো দৃষ্টান্ত।

এরপরে আসা যাক মার্কস্‌বাদী ঐতিহাসিকদের প্রসঙ্গে যাঁরা 'ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসে' কংগ্রেসপন্থী ঐতিহাসিকদের স্থান দখল করে। মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বী, রামশরণ শর্মা, রোমিলা থাপার, বিপান চন্দ্র, মুহম্মদ হাবিব, ইরফান হাবিব, ইন্দু বঙ্গ, ইশরত আলম প্রমুখ। বর্তমানে 'ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের' কর্তৃত্বে আছেন মার্কসবাদী ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব, ইন্দু বঙ্গ, ইশ্‌রাত আলম, রমেশ রাওয়াত, অমর ফারুকি প্রমুখ ব্যক্তি। এঁরা ঐতিহাসিক ঘটনার তথ্য, পাথুরে প্রমাণ ইত্যাদির পরিবর্তে ঘটনাবলীর 'Interpretation' বা বিশ্লেষণের উপর জোর দেন। যেমন ইরফান হাবিব তাঁর

SHYAM TEXTILES LTD.

156A, MAHATMA GANDHI ROAD

KOLKATA - 700 007

BANSIDHAR BADRIDAS MODI (P) LTD

ORIENTAL HOUSE

6–C, ELGIN ROAD, 4TH FLOOR

KOLKATA-700 030

PH : 2280-5464, 22832421

OWNERS : SREE SIBBARI T.E

HEAD-OFFICE

P.O - DIBRUGARH, ASSAM

'Interpreting Indian History'-তে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ঐতিহাসিক পুনর্নির্মাণে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের উপর জোর দিয়েছেন। যেমন সুলতান মামুদের সোমনাথ মন্দির আক্রমণের ঘটনাকে ব্যাখ্যা করেছেন তাৎক্ষণিক এবং কেবলমাত্র সম্পদ লুণ্ঠন হিসেবে। কিন্তু শুধু সম্পদ লুণ্ঠন করতে মন্দির ধ্বংস করার প্রয়োজন হয় না; মন্দির ধ্বংস ধর্মীয় কারণেই করা হয়। কিন্তু এদিকটি তিনি চেপে গেছেন। তাঁর পিতা এবং ঐতিহাসিক মুহাম্মদ হাবিব তাঁর 'Studis in Medieval Indian Polity and culture' পুস্তকে এই একই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মালদহ অধিবেশনে এই পুস্তকটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করা হয়।

এছাড়াও এই অধিবেশনে রিজ্‌ভির Fatepur Sikri Revisited, শিরীন মুস্‌ভি'র The Economy of the Mughal Empire ইত্যাদি পুস্তকের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করা হয়। উল্লেখ্য যে এঁরা সবাই 'আলিগড় স্কুলের' এবং মার্কসবাদী ঐতিহাসিক। এঁরা কেউই ভারতীয় 'দৃষ্টিকোণ' থেকে ইতিহাস লেখেন না। এদের লেখায় প্রচ্ছন্নভাবে ভারতীয় সমাজ ও ধর্মের বিরোধিতা থাকে। ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনার চাইতে এঁরা মার্কসীয় 'দৃষ্টিকোণ' থেকে ঘটনার 'Interpretation' বা ব্যাখ্যায় জোর দেন। ভারতে বিভিন্ন বৈদেশিক আক্রমণ ও বর্বরতা এঁদের ব্যাখ্যায় মান্যতা পেয়ে যায়।

'আলিগড় স্কুলের' এবং মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরা কেউই ভারতীয় 'দৃষ্টিকোণ' থেকে ইতিহাস লেখেন না। এদের লেখায় প্রচ্ছন্নভাবে ভারতীয় সমাজ ও ধর্মের বিরোধিতা থাকে। ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনার চাইতে এঁরা মার্কসীয় 'দৃষ্টিকোণ' থেকে ঘটনার 'Interpretation' বা ব্যাখ্যায় জোর দেন। ভারতে বিভিন্ন বৈদেশিক আক্রমণ ও বর্বরতা এঁদের ব্যাখ্যায় মান্যতা পেয়ে যায়।

বিভিন্ন প্রখ্যাত, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিসম্পন্ন জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকগণ এঁদের ব্যাখ্যায় হয়ে যান সাম্প্রদায়িক, সংকীর্ণমনা। আর্থিক ও উৎপাদনের দিকটিই এঁদের ইতিহাস বিশ্লেষণে প্রাধান্য পায়। ইতিহাস 'বিনির্মাণে' ধর্ম ও সমাজের ভূমিকা এদের কাছে গুরুত্বহীন। জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকগণ যেমন, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, স্যার যদুনাথ সরকার, আর. জি. ভাণ্ডারকর, কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল এস এন সেন প্রমুখ ঐতিহাসিক এঁদের কাছে সাম্প্রদায়িক, পুরাতনপন্থী হিসেবে গণ্য হন।

যাই হোক, 'ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসে' মার্কসবাদীদের প্রবল দাপট ভারতের সঠিক, তথ্যনিষ্ঠ এবং দেশজ আকরকে ভিত্তি করে ইতিহাস রচনা রুদ্ধ করেছে। তথ্যনিষ্ঠ, জাতীয় গৌরবে আস্থাবান জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের এগিয়ে এসে 'ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসে' স্থান নিতে হবে এবং ইতিহাস রচনাকে ভারতমুখী করতে হবে।

কালিয়াচকে হামলার সময় প্রশাসন ছিল নিষ্ক্রিয়

সংবাদদাতা ॥ গত ৩ ডিসেম্বর মালদা জেলার কালিয়াচকে সাত ঘণ্টা ধরে জেহাদি মুসলমানরা তাণ্ডবনৃত্য করলেও প্রশাসন থেকে কোনো প্রকার অতিরিক্ত পুলিশবাহিনী, র‍্যাফ কিংবা আধাসেনাবাহিনী মোতায়েন করেনি। সেদিন সাংবাদিকরা ক্যামেরা খুললেই তাদের দিকে পিস্তলের নল দেখিয়ে ছবি তুলতে বাধা দেয় জেহাদিরা। অগ্নিসংযোগে একের পর এক গাড়ির টায়ার ফাটার শব্দ, বোমফাটার আওয়াজ এবং ধোঁয়াতে চারিদিক অন্ধকার হয়ে যায় এবং স্থানীয় হিন্দুরা অসহায় অবস্থায় সাহায্যের জন্য প্রশাসনের কাছে ফোন করলেও কেউ তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি। তখন হিন্দুরা নিজেরাই প্রতিরোধ গড়ে রুখে দাঁড়ায়। সাংবাদিকরা ভয়ে পালিয়ে মোথাবাড়ী পুলিশ ফাঁড়িতে আশ্রয় নিয়ে পুলিশ সুপার এবং জেলাশাসককে অশান্ত কালিয়াচকের কথা বললেও জেলা প্রশাসন সব নিয়ন্ত্রণে আছে বলে মিথ্যা প্রবোধবাক্য প্রয়োগ করে। অথচ তখনও হিন্দুদের দোকান ও বাড়ি থেকে মোটরসাইকেল জোর করে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। সাংবাদিকদের ছবি তুলতে বাধা দিচ্ছে। সাত ঘণ্টা পর দমকলের দুটি গাড়ি আসে আগুন নেভাতে যার মধ্যে একটি গাড়ি খারাপ হয়ে মাঝ পথে থেমে থাকে এবং অন্যটি ঘটনাস্থলে আসে আগুন নেভাতে। ততক্ষণে বেশিরভাগ গাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়, থানার নথিপত্র ও গ্রন্থাগারের বই পুড়ে ছায় যায়। চারিদিকে শ্মশানের পরিবেশ। তবে দেখার বিষয়, থানার পাশের মুসলিম হোস্টেলের কোনো ক্ষতি হয়নি এবং মুসলমানদের দোকানও অক্ষত আছে। থানার পাশ থেকে একটি শক্তিশালী গ্রেনেড পাওয়া গেছে যেটি ফাটেনি। কিন্তু সেই ছবি তোলার পরই পুলিশ তড়িঘড়ি সেটি সরিয়ে ফেলে। পুলিশকর্মীরা কালীমন্দির কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়। অর্থাৎ গোয়েন্দা দপ্তরের ব্যর্থতা, পুলিশের অপদার্থতা এবং জেহাদি মুসলমানদের কাছে আত্মসমর্পণের কলঙ্কের ছবি যেন কেউ দেখতে না পায়, তার জন্যই কি এই ব্যবস্থা? প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ৮ জানুয়ারি বিহারের পূর্ণিয়া শহরে একই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। সেখানেও পুলিশ প্রশাসন নিষ্ক্রিয় ছিল।

With Best
Compliments From :-

ASHOK AGARWALA

PRAGATI IMPEX PVT. LTD.

5, Clive Row, 2nd Floor,
Room No. 41
Kolkata - 700 001

DAYAL INDUSTRIES

DAYAL GROUP

MAKER OF SAFETY RAZOR BLADES

Works
GOPALPUR HOUSE P.O. : R. GOPALPUR
GOPALPUR, 24 PARGANAS (North)
PIN-700 136, Phone-2573-6459

Office :
3, Synagogue Street,
Room No. 12, 2nd Floor, Kolkata 700 001
PHONE : 22424296/22434571 TELEFAX : 033-22421761

কি করব—বিদেশি ভাষার দাসত্ব, না মাতৃভাষার প্রতি আনুগত্য ?

সুতপা বসাক ভড়

পথ চলতে শুনছি— ‘‘হাই, হাউ আর ইউ? তোকে খুব মিস্ করছি, বাট্, কি করি বল? আই অ্যাম ইন হারি, সরি, বাই, মিট ইউ ল্যাটার থ্যাঙ্ক ইউ।’’ বয়স্কদের বার্তালাপ— ‘‘কি খবর? খুব বিজি নাকি? টাইম নেই?’’ কাজের লোকের ভাষা— ‘‘টেইম নেই বৌদি, খুব বিজি।’’ কী ভাষা এটা? আমরা বাঙালি। বঙ্গ সংস্কৃতির একটি সুস্থ, সুন্দর, প্রাচীন সংস্কৃতি হিসাবে পরিচয় আছে দেশে বিদেশে, আমাদের সংস্কৃতির একটি অন্যতম সম্পদ হলো চর্যাপদ। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিরা বাংলা ভাষাকে যে জায়গায় বসিয়ে দিয়ে গেছেন, তার জন্য আমরা তাঁদের কাছে চিরঋণী হয়ে থাকব। বাংলাভাষার আদি, বৈচিত্র্য এবং প্রসার অনুসন্ধানে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেনের অবদান অনস্বীকার্য। বর্তমান যুগের লেখক-লেখিকারাও বাংলাভাষাকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করার যজ্ঞে ব্রতী। তবে, ওই কথোপকথনগুলি কোথা থেকে এল? এগুলি সামান্য উদাহরণমাত্র। স্বামীর কর্মসূত্রে বাংলার বাইরে থাকি, অনেক আশা নিয়ে যখন কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হই, তখন ট্রেন পশ্চিমবঙ্গে ঢুকলেই মনপ্রাণ খুশিতে ভরে ওঠে। তারপর ক্রমশ যখন বাংলাভাষা, পোশাক, সংস্কৃতির অবক্ষয় দেখি তখন মনটা ভারী হয়ে ওঠে। আজ থেকে কুড়ি-বাইশ বছর আগেও বাংলা ভাষার এই দুর্দশা ছিল না। টেলিভিশন আর ইন্টারনেট পৃথিবীকে আমাদের এত কাছে এনে দিয়েছে যে আমরা আমাদের মাতৃভাষাকেই দূরে ঠেলে দিয়েছি; পরিবর্তে শেকড়বিহীন উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রার জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিয়েছি। বঙ্গাব্দে ১৪১৯ স্বস্তিকার নববর্ষের সংখ্যা উদ্বোধন উপলক্ষে কেশবভবনে আয়োজিত সভাতে দ্য স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার একজন বিদগ্ধ সাংবাদিক— যিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেব, মা সারদা এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারায় বিশ্বাসী

> ভাষা থাকলে— সংস্কৃতি থাকে। সংস্কৃতিই আমাদের ধরে রাখে— এই আমাদের ধর্ম। এইদিক থেকে দেখলে মাতৃভাষার সম্মান করা আমাদের ধর্ম। আমাদের মনে রাখতে হবে যে মাতৃভাষা, মাতৃভূমির সম্মান, ঐতিহ্য রক্ষা হলে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা সম্ভব হবে।

বলেছিলেন যে বর্তমান প্রজন্ম টানা পাঁচ মিনিট নিজের মাতৃভাষায় কথা বলতে পারে না বা বলতে চায় না! অথচ ওই ভদ্রলোক প্রায় তিরিশ মিনিট ধরে একটিও বিদেশি শব্দ ব্যবহার না করে বাংলা ভাষায় একটি সুন্দর, সাবলীল, হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রেখেছিলেন।

এ আমরা কি করছি? কোন্ পথে চলেছি? সিঁড়ির প্রথম ধাপকে সরিয়ে দিয়ে বা অস্বীকার করে কোন্ উঁচু অট্টালিকায় ওঠার চেষ্টা করছি? কথা বলার সময় একটু সচেতন হলে কোনো বিদেশি ভাষার সাহায্য ছাড়াই আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারি— কারণ এ হলো আমাদের মাতৃভাষা। কবি লিখেছেন, ‘‘মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা’’— এ কি শুধুমাত্র বই-এর পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করার জন্য? পরীক্ষায় সফল হবার জন্য বাংলার নম্বর খুব জরুরি, অথচ ফল বেরোলে ইংরেজির নম্বর বাংলার থেকে বেশি হলে আত্মতৃপ্তি ভোগ করি। নিজেদের বিদেশি ভাষার পোষ্য হিসাবে ভাবতে গৌরবান্বিত হই!

পথে-ঘাটে ইংরেজিতে কথা বলা লোকের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। কেন বাড়বে না? তবেই তো তারা জাতে ওঠে! একটু ভাবুন তো— মাতৃভাষায় কথা বলে কেন আমরা গৌরাবান্বিত হই না? কেন বিদেশি ভাষার প্রতি এই আসক্তি? কেন এই লোকদেখানো বিকৃত মনোবৃত্তি? মাতৃভাষায় কথা বলা, চিঠি লেখা কি অশিক্ষার ছাপ? আর বিদেশি ভাষার যথেচ্ছ ভাবে, যত্রতত্র প্রয়োগ, সেটা? —সেটা হলো কুশিক্ষার চরম নিদর্শন! ইংরেজরা আমাদের ওপর দাসত্ব করেছে বহুবছর। আমাদের জন্মভূমির কৃতী সন্তানেরা নিজেদের জীবনের বলিদান দিয়ে আমাদের জন্য স্বাধীন ভারত দিয়ে গেছেন। তাঁরা কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলেন যে

তাঁদের এই বলিদানকে আমরা স্বেচ্ছায় অবহেলা করে ওই বিদেশি ভাষার দাসত্ব করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠব? যে বিদেশিদের তাড়াতে তাঁরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, সেই বিদেশিদের ভাষায় কথা বলার জন্য আমরা হাঁকপাঁক করব? এই দাসত্বের মানসিকতা নিয়ে আমরা যদি নিজেদের উন্নতির আশা করি আর কথা বলি তাহলে বলব আমাদের মতো নরাধম-বেইমান জাত কোথাও নেই। ধিক! ধিক, আমাদের এই মানসিকতাকে। যতক্ষণ না পর্যন্ত নিজের মতো করে ভাবতে পারব, নিজের ভাষা-সংস্কৃতিকে ভালবাসতে পারব, মাতৃভাষায় কথা বলে নিজেদের গৌরবান্বিত করব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির কোনো আশা নেই।

ইংরেজি ভাষাকে খারাপ বলব না বা ত্যাগ করব না—এটি বিশ্বায়নের ভাষা, প্রয়োজনীয় ভাষা, কিন্তু এর অপ্রয়োজনীয় ব্যবহারও করব না। বাংলা চ্যানেলগুলির ওপরেও প্রতিবন্ধকতা থাকা উচিত। বাংলা অনুষ্ঠানে আমরা বাংলাভাষাই শুনতে চাই, খিচুড়ি ভাষা নয়। বাংলা চলচ্চিত্র সম্বন্ধেও আমার একই মত। প্রয়াত স্বনামধন্য পরিচালক সত্যজিৎ রায় তাঁর একটি চলচ্চিত্র 'আগন্তুক'-এর একটি মুখ্য চরিত্র, যিনি দীর্ঘদিন ধরে মাতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন, তাঁর মুখে শুদ্ধ বাংলা ভাষা দিয়েছেন— এ প্রসঙ্গে অপর একটি চরিত্র বিস্ময় প্রকাশ করলে প্রথমোক্ত চরিত্রটির বক্তব্য : ইচ্ছে করলে কেউ ছ'মাসেই তার মাতৃভাষা ভুলে যাবে, নাহলে সারাজীবন সে তার মাতৃভাষায় কথা বলতে পারবে।"

মাতৃভাষার প্রচার-প্রসার এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান খুবই জরুরি। বিশ্বের সমস্ত বিকশিত দেশ নিজের নিজের মাতৃভাষায় প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষা দেয়। ইজরায়েলের শিশুরা হিব্রু এবং চীনের শিশুরা মান্দারিন ভাষায় পড়াশুনা করে। জাপান, রুশ, কোরিয়া, ফ্রান্স, জার্মান নিজের ভাষাতে শিশুদের বড় করে, অথচ ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, কংগো, ইথিওপিয়া, চান্দ, বুরুন্ডি, মালি ইত্যাদি দেশগুলি নিজেদের অতীতের ইউরোপীয় শাসকদের ভাষাকে মাথায় তুলে রেখেছে। বিশ্বের শীর্ষদেশগুলি নিজের নিজের মাতৃভাষার গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে এগিয়ে চলেছে আর উন্নয়নশীল দেশগুলি বিদেশি ভাষার ব্যবহার করে রসাতলে যেতে বসেছে।

সংস্কৃতের মতো প্রাচীনভাষা যা আমাদের দেশের সব আঞ্চলিক ভাষার জননী, তাকে অবহেলা করেছি আমরা, অথচ আমাদের দেশের ঋষিরা যে কষ্টার্জিত জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তা জানার জন্য সংস্কৃত ভাষা-জ্ঞান অনিবার্য। পৃথিবীতে প্রায় ১৫ লক্ষ পাণ্ডুলিপির গ্রন্থ আছে, তার মধ্যে ৬০ শতাংশ সংস্কৃত ভাষায় লেখা। এইরকম লক্ষাধিক সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার এখনও পর্যন্ত হয়নি— আমাদের অজ্ঞানতাই এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী।

কোনো বিদেশি রাষ্ট্র যখন অপর একটি রাষ্ট্রকে নিজ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়, তখন তাদের একটি লক্ষ্য হয় ওই দেশের মাতৃভাষাকে অবমাননা করে বিজিত দেশের নাগরিকদের মনের মধ্যে তাদের মাতৃভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি হীনমন্যতা গড়ে তোলা। এর সঙ্গে বিজয়ী রাষ্ট্র তাদের ভাষা, সংস্কৃতিকে বিজিত রাষ্ট্রের ওপর লাগু করে। ফলস্বরূপ, বিজিত দেশের নাগরিকেরা কয়েক যুগের মধ্যেই নিজ ভাষা, সংস্কৃতি ভুলে শাসকদের ভাষা, সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করে গৌরবান্বিত বোধ করে। সময়চক্রে, পরিস্থিতিসাপেক্ষে শাসকরা বিজিত দেশটি ত্যাগ করলেও তারা শেষ পর্যন্ত সফল হয় তাদের কূটনৈতিক চক্রান্তে— বিজিত দেশটিতে দীর্ঘস্থায়ীভাবে শাসকদের ভাষা সংস্কৃতির প্রচার-প্রসার হতে থাকে। এইভাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিজিত দেশটি দীর্ঘদিন ধরে ওই শাসকদেশের দাসত্ব করে, যদি না তারা সজাগ, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এবং তীব্র দেশপ্রেমী হয়। নিজের ভাষা, সংস্কৃতি ভুলে গেলে মানুষ তার আত্মপরিচয় ভুলে যায়। আমরা কারা, কোথা থেকে এসেছি, কেন এসেছি--- সব ভুলে বিদেশিদের পরিকল্পনা মাফিক চক্রান্তের ফাঁদে পড়ে যাই। ভাষা থাকলে— সংস্কৃতি থাকে। সংস্কৃতিই আমাদের ধরে রাখে— এই আমাদের ধর্ম। এইদিক থেকে দেখলে মাতৃভাষার সম্মান করা আমাদের ধর্ম। আমাদের মনে রাখতে হবে যে মাতৃভাষা, মাতৃভূমির সম্মান, ঐতিহ্য রক্ষা হলে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা সম্ভব হবে। ▮

১৯৪৮ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত
জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

প্রতি সংখ্যা ১০ টাকা

স্বস্তিকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০টাকা

অবহিত হবার এবং অবগত করার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম

—ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—
২৭/১বি, বিধান সরণি, কোলকাতা-৭০০০০৬
দূরভাষ (০৩৩) ২২৪১০৬০৩, ২২৪১৫৯১৫

পাঠানকোটের মোকাবিলা

পাকিস্তানেরই কায়দায় ছায়াযুদ্ধ চালাতে হবে

অতিথি কলম

সুবীর ভৌমিক

ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে অনুষ্ঠিতব্য দ্বিপাক্ষিক আলোচনাকে বানচাল করে দিতেই যে পাঠানকোট কাণ্ড ঘটানো হলো তা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। মনে পড়বে ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর লাহোর শুভেচ্ছা-যাত্রার পরে পরেই কার্গিলের মতো পুরোদস্তুর যুদ্ধ শুরু হয়। তেমনই প্রধানমন্ত্রী মোদীর পূর্ণ সদিচ্ছাব্যঞ্জক লাহোর অবতরণ ও নওয়াজ শরিফের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ঘৃণ্য প্রত্যুত্তরই পাঠানকোট। খেয়াল রাখতে হবে পাঠানকোট আক্রমণের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই উত্তর আফগানিস্তানের 'মাজার এ শরিফের' ভারতীয় দূতাবাসেও জোহাদি সন্ত্রাস চলে। পেছন ফিরলেই দেখা যাবে ২০১৪ সালের মে মাসে প্রধানমন্ত্রী মোদীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই 'হেরালে' অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসেও একই ধরনের জেহাদি হামলা হয়। সেই কারণে একথা নিশ্চিত করেই বলা যায় এটা কখনই কোনো হিংস্র জেহাদি সংগঠনের উত্তেজনার বশে তাৎক্ষণিক কোনো হামলা নয়। বরঞ্চ অতি সুপরিচালিত ভাবে তৈরি আই এস আই-এর পাকা মাথার নোংরা খেলা যা পক্ষান্তরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বকলমেই সংঘঠিত হয়েছে।

এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় আমাদের এখানে যথেষ্ট বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে। অপ্রচলিতভাবে মোদীর শরিফের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের নীতিগত যথার্থতা নিয়ে নানা প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে। বসে নেই কংগ্রেসও। প্রত্যাশিতভাবে বিষয়টাকে নিয়ে তারা তোলপাড় করার চেষ্টা করছে। কিন্তু এই সময় দেশের অভ্যন্তরে এমন কুশ্রী বিবাদ আদৌ কাম্য নয়। জাতি হিসেবে ভারতের তরফে পাকিস্তান সম্পর্কে সঠিক নীতি নেওয়া এখন অত্যন্ত জরুরি।

অতীতে কোনো আক্রমণের প্রত্যুত্তরের সঙ্গেই সঙ্গেই পারস্পরিক আলোচনা বন্ধ করার পরিণতি আদৌ ফলদায়ী হয়নি। কূটনৈতিক দূরদর্শিতার ক্ষেত্রে এমন হামলার পরই আলোচনার বাতাবরণ রুদ্ধ করাকে ভারতের তরফে নেহাতই নাবালকত্বের পরিচয় বলেই গণ্য হয়েছে। পরবর্তী সময়ে দেশকে পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনায় বসতে খানিকটা বাধ্যই করেছে আন্তর্জাতিক মহল। তাই, দুম করে জেহাদি হামলার প্রতিক্রিয়ায় আলোচনা রদ করে দেওয়া সাময়িকভাবে হয়তো শাসকদলকে লোক দেখানো জাতীয়তাবাদী হাততালি কুড়োতে প্ররোচিত করতে পারে বা বিরোধী দলের হুঙ্কার থামাতে পারে, কিন্তু আখেরে পাকিস্তানের মতো সর্বদা সমস্যাসৃষ্টিকারী এক প্রতিবেশীকে বাগে আনতে আদৌ সহায়ক হবে না। অবশ্য এই ইস্যু নিয়ে বিরোধীরা সরকারকে লাগাতার নাস্তানাবুদ করার চেষ্টার কসুর করবে না।

আর একটা কথা নিশ্চিত করেই বলা যায় পাকিস্তানে যে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকদের অংশ যারা ভারতের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় আন্তরিক আস্থা রাখে তারাও যথেষ্ট হতাশ হবে। পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলি, নাগরিক সমাজ, শিল্প ও বাণিজ্য মহল ও সেখানকার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সঙ্গে ভারতকে মত বিনিময় করতেই হবে। এই সূত্রে উভয় দেশের মধ্যে শিক্ষার্থীদের যাতায়াত বিশেষভাবে বাড়ানো দরকার। পাকিস্তানি পড়ুয়াদের জন্য আরও বেশি স্কলারশিপ, উভয় দেশের মধ্যে যুব উৎসব, নিয়মিত সাংস্কৃতিক উৎসব এগুলি আমরা অনায়াসেই চালু করতে পারি। এই সব নবীন প্রজন্ম আমাদের ভারতের বাস্তব অবস্থা দেখে তাদের দেশে নতুন ভাবনাচিন্তা বয়ে নিয়ে যাবে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আমেরিকার ওপর উপর্যুপরি চাপ বাড়িয়ে পাকিস্তানকে জেহাদিদের সঙ্গে হাত মেলানোর প্রক্রিয়া থেকে সরিয়ে আনতে পারি। তাই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে কথাবার্তা চালানোর আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। সেই কাজটা আন্তর্জাতিক মঞ্চে করবে আমেরিকা যারা বরাবর ভারতকে পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চাপ সৃষ্টি করে। অন্যদিকে ভারত পাকিস্তানের সদর্থক চিন্তাধারার সহিষ্ণু ও বন্ধুত্বপূর্ণ মানসিকতার নাগরিকদের সঙ্গে আলোচনা চালাবে। এই প্রক্রিয়া আগে বলা বিনিময়তত্ত্বের সঙ্গে ট্র্যাক-২ কূটনীতির প্রয়োগের মাধ্যমে যুগপৎ করতে হবে। নিজেদের একেবারে গুটিয়ে নিয়ে ঘরের মধ্যে ফোঁস করলে শুধু পাকিস্তানি সেনা, আই এস আই এবং জেহাদির ত্র্যহস্পর্শকেই পক্ষান্তরে মদত দেওয়া হবে।

কিন্তু একটা ব্যাপার নিশ্চিত করা দরকার যে পাকিস্তানে ক্ষমতাসীন যে সরকার সে বাস্তবে যতই সেনাবাহিনীর ক্রীড়নক হোক না কেন, সরকারিভাবে তার সঙ্গেই কথা চালাতে হবে। অন্যদিকে আমেরিকার ওপর পাকিস্তানি সেনা ও আই এস আই উভয়কে লাগাম পরানোর জন্য কূটনৈতিক চাপ জারি রাখতে হবে। এই দু'টো কৌশল ছাড়াও আমাদের সামগ্রিক পাকিস্তান নীতিতে আর একটা তৃতীয় রাস্তাও নেওয়া দরকার। আর সেটি হলো তাদেরই কায়দায় ছায়াযুদ্ধ চালিয়ে পাকিস্তানের সামরিক সম্পদের (অস্ত্রশস্ত্র, বিমান সজ্জা) ক্ষতি করা।

ঠিক এই কথাটাই একজন পূর্বতন 'র'

(RAW) অধিকর্তা সাম্প্রতিক টিভি চ্যানেলগুলিতে অহরহ বলে চলেছেন। ছায়াযুদ্ধকে পরাস্ত করতে পালটা ছায়াযুদ্ধই চালাতে হবে। সদ্য সদ্য পাঠানকোট কাণ্ড ও তার আগে পাঞ্জাবের গুরুদাসপুরের হামলায় জলজ্যান্ত প্রমাণ পাওয়া গেছে। যেগুলি আই এস আই-এর আশীর্বাদপ্রাপ্তই শুধু নয়, এর পেছনে রয়েছে তাদের দীর্ঘ পরিকল্পনা। আমাদের 'র'-এর গোয়েন্দা বিভাগ আই এস আই-এর চাঁইয়ের সঙ্গে জৈস-এ-মহম্মদের জঙ্গিগোষ্ঠীর মোলাকাতের নিশ্চিত খবর পাওয়ার পরই সতর্কতা জারি করেছিল। আদতে ভারতকে 'শঠে শাঠ্যং' নীতিতেই প্রত্যুত্তর দিতে হবে। সঙ্গে নজর রাখতে হবে পাকিস্তানের নিরস্ত্র নাগরিকরা যেন অপ্রয়োজনীয় ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হন। নিরপরাধী পাকিস্তানিরা যেন তাদের ইউনিফর্মধারী বাহিনীর বদমায়েশির ফল না ভোগ করেন। ভারতকেও পাকিস্তানের অভ্যন্তরে তার চোরাগোপ্তা আক্রমণে সক্ষম শক্তি বাড়াতে হবে যাতে ঠিক পাঠানকোটে যে কায়দায় তারা আক্রমণ শানিয়েছে, ভারতের সেনাবাহিনীর ছাউনিকে লক্ষ্য বানিয়েছে ঠিক তারই ফোটোকপি হৈ হল্লা না করে পাকিস্তানেও চালাতে হবে।

প্রসঙ্গত বলা দরকার এই ধরনের কৌশল যে অতীতে নেওয়া হয়নি বা একেবারেই অপরীক্ষিত তা কিন্তু নয়। 'র'-এর পূর্বতন প্রবাদপ্রতিম আধিকারিক বি রামন তাঁর সাম্প্রতিক 'Kaoboys of RAW' গ্রন্থে লিখেছেন— ১৯৮০ দশকের শেষাশেষি পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে গোপন প্রত্যাঘাতের লাগাতার প্রক্রিয়া চালিয়েই আমাদের পাঞ্জাব রাজ্যে পাকিস্তানি সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সম্পূর্ণ খতম করা গিয়েছিল। বস্তুত পাকিস্তান হাল ছেড়ে দেয়।

তাই, ভারত একদিকে যেমন পাকিস্তানের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিক শ্রেণীর সঙ্গে সংযোগ ও আলোচনা বজায় রাখবে সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে ঠিক তাদের পথেই জুতসই জবাব দিতে হবে। আনন্দের কথা, এন এস এ-তে অজিত দোভাল নামে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এক গুপ্তচর প্রধান রয়েছেন যিনি বিশেষ বিশেষ অভিযান চালাতে যথার্থ পারদর্শী। সিকিউরিটি এজেন্সির অন্যান্য অধিকর্তারাও পাকিস্তানের ঘাম ছুটিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

এ প্রসঙ্গে ছোট্ট সীমান্ত রাজ্যের উদাহরণ অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। খালেদা জিয়ার শাসনকালে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার এই উপযুক্ত প্রত্যুত্তর (appropriate response) দেওয়ার নীতি অনুসরণ করেই আশ্চর্য ফল পেয়েছিলেন। ভারতের কাছে বাংলাদেশের আত্মসমর্পণ করা সন্ত্রাসবাদী ও ভাড়াটে খুনির বাহিনীকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গোপনে ঢুকিয়ে তাদের সন্ত্রাসী ডেরাগুলি একের পর এক ধ্বংস করেছিলেন মানিকবাবু। এদিকে আজকের বন্ধুত্বপূর্ণ শেখ হাসিনা সরকারের আমলে তিনি ত্রিপুরার সঙ্গে ঢাকার সড়ক যোগাযোগ বাণিজ্য ও পারস্পরিক সম্পর্কের পরিধিকে মসৃণভাবে বাড়িয়ে নিয়ে চলেছেন। কাজের কাজ নিঃশব্দে করে রেখেছেন।

এই জায়গাতেই বলতে দ্বিধা নেই মানিক সরকারের কাছ থেকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী অতি প্রয়োজনীয় কর্তব্যটি শিখে নিতে পারেন। গোপন অপারেশন চালাবার সময় তিনি যেমন মুখ বন্ধ করেছিলেন, কাকপক্ষীও টের পায়নি সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করা। তাই প্রথমেই দরকার দিনরাত বকবক করা তাঁর কিছু মন্ত্রী সাংসদকে দাবড়ে দেওয়া। মানিকবাবু চুপচাপ থেকে নজর রাখেন, সীমান্তের ওপার থেকে কোনো গড়বড়ের ন্যূনতম ইঙ্গিত পেলেই কঠোর হাতে তা দমিয়ে দেন। লক্ষ্য করার বিষয়, আজকের ত্রিপুরায় বিদ্রোহী কার্যকলাপ সম্পূর্ণ ইতিহাস হয়ে গেলেও মানিকবাবু সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে প্রধানমন্ত্রী হাসিনাকে কখনই মনে করাতে ভোলেন না যে বাংলাদেশের চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে এখনও ১৭/১৮টি বিদ্রোহী আখড়া জীবিত রয়েছে। মহান ও সদাসতর্ক থাকা আবশ্যিক— শর্ত ধূর্ত প্রতিবেশীর ক্ষেত্রে ঢিলেমির কোনো স্থান নেই।

বাস্তবে পাকিস্তান এক বিচিত্র চিন্তাধারার দেশ। তাই, এক ধাঁচের কোনো কাঠামোয় একে আঁটা যাবে না। তাই বাগে আনারও কোনো সোজাসাপটা ফর্মূলা নেই। সেই কারণে (১) আমাদের সেই দেশ ও নাগরিকদের সঙ্গে লেগে থাকা। অর্থাৎ তাদেরও কথাবার্তায় ব্যস্ত রাখা, (২) পাঠানকোট আক্রমণের যথাযোগ্য ভাষাতেই অর্থাৎ চোরাগোপ্তা সশস্ত্র আক্রমণের প্রত্যুত্তর মধ্যে দিয়ে দেওয়ার ফুল প্রুফ ব্যবস্থা করা। কিন্তু তার আগে আমাদের রাজনীতিবিদদের মুখে কুলুপ এঁটে দিতে হবে। পাকিস্তানে কোনো সেনা ছাউনিতে সংঘর্ষ হলে না জানার ভান করতে হবে। সাফল্য এলে বুক বাজিয়ে ঢোল পেটানো কাউন্টার প্রোডাকটিভ হবে। তাই নীতি বাক্যটি হলো— গোপন অপারেশন তখনই সাফল্য দেয় যত বেশিক্ষণ তা গোপন থাকে। আর পাকিস্তানের মতোই সরাসরি অস্বীকার করা ও প্রয়োজনে দু'মুখো কথা বলার ওপরই এর কার্যকারিতা নির্ভরশীল।

(লেখক প্রবীণ সম্পাদক, ঢাকার বাংলাদেশ নিউজ ২৪ ডট কম)

With Best Compliments from-

A Well Wisher

‘লড়াই করতে হবে রাস্তায় নেমে’

সম্প্রতি রাজ্য বিজেপির সভাপতির দায়িত্বে নিযুক্ত হয়েছেন দিলীপ ঘোষ। নবনিযুক্ত রাজ্য সভাপতির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হয়েছিলেন স্বস্তিকার প্রতিনিধি শুভাশিস রায়। সেই একান্ত সাক্ষাৎকারটি এখানে প্রকাশ করা হলো। —স্বঃ সঃ

■ **আপনি দীর্ঘদিনের সমাজকর্মী। বর্তমানে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দায়িত্ব পেয়েছেন। দুই ক্ষেত্রের মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক। আপনার মানিয়ে নিতে অসুবিধা হবে না?**

■ আলাদা হলেও দু'টি কাজই এক। সমাজে দু'টি কাজেরই প্রয়োজন। মূল কাজ হলো মানুষের কাজ, মানবতার কাজ, সমাজের সেবা করার কাজ। রাজনীতিতে অনেক সুযোগ-সুবিধা থাকে। সরকারি মাধ্যমে প্রচার, টাকা-পয়সা, গাড়ি বাড়ি হয়ে থাকে। আর অন্য সামাজিক সংগঠনের মধ্যে দিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে তাদের সঙ্গে কাজ করার ব্যাপার থাকে। সেখানে সরকারি সাহায্যের ব্যাপার কম। মানবিকতা মনুষ্যত্ব বোধের গুরুত্ব বেশি। এখানে প্রশাসনে সরকারি প্রভাব বেশি। তবে প্রধান কথা হলো— আগে যে দায়িত্বে ছিলাম তাও যেমন করতে পেরেছি, বর্তমানে এই দায়িত্বও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করব বলে আশা রাখছি।

■ **রাজ্য বিজেপিতে রাজ্য সভাপতি পরিবর্তন হবে এটা অনেকদিন ধরেই হাওয়ায় ভাসছিল। অনেকেই এটা ভেবেছিলেন রাজ্য বিজেপিতে দীর্ঘদিনের যাঁরা পরিচিত মুখ তাঁদের মধ্যেই কেউ হবেন। কিন্তু তুলনামূলকভাবে আপনি নবাগত। এক বছর বিজেপিতে এসে রাজ্য সভাপতির মতো গুরুদায়িত্ব পেলেন। এক্ষেত্রে কী বলবেন?**

■ এ বছর দলের সাংগঠনিক স্তরের সমস্ত পরিবর্তন হচ্ছে। বিশেষ করে রাজ্য সভাপতির ক্ষেত্রে দু'টি টার্ম তিন তিন ছ'-বছরের বেশি কেউ থাকতে পারবেন না। সেই হিসাবে রাজ্য সভাপতি পরিবর্তন হয়। এক্ষেত্রে আমার নাম হঠাৎই আসে। আমি কোনোদিন ভাবিনি আমার নাম উঠে আসবে। সঙ্ঘের প্রচারক হিসাবে সঙ্ঘ যেখানে যা দায়িত্ব দিয়েছে চেষ্টা করেছি নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার। আন্দামানে গিয়েছি সংগঠন করতে। সরাসরি রাজনীতির ময়দানে কাজ করিনি, কিন্তু ১৯৮২ সাল থেকে বিভিন্ন নির্বাচনে আমি কাজ করেছি। ৯৮, ৯৯ এবং গত ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে দায়িত্ব ছিল। যেহেতু সঙ্ঘের বিভাগ প্রচারক ছিলাম তাই রাজনীতিকেও দেখতে হোত। বিজেপির প্রশিক্ষণ বর্গে গিয়ে সেখানে সংগঠন, বিজেপির আদর্শবাদ সম্পর্কে অনেক বক্তব্য রাখতে হয়েছে আমাকে। জনসভায় গিয়ে রাজনীতি করিনি কিন্তু সংগঠনটা তৈরি করেছি। বিজেপিতে এসে প্রথমে সাধারণ সম্পাদকের কাজ করলাম। এতে রাজনীতির ময়দানে নেমে কীভাবে কাজ করতে হয় তা শিখতে পেরেছি। অর্থাৎ বিয়ে না করলেও বিয়ে দেখেছি। সেই অভিজ্ঞতা থেকে কাজ করছি।

■ **প্রতিটি রাজনৈতিক দলেই সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক পূর্ব পরিকল্পনা থাকে। সেই অনুযায়ী রাজ্য বিজেপিতে সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছু বলুন।**

■ ঠিক, প্রতিটি দলের মতো আমাদেরও আছে। সাংগঠনিক কাজ সারা বছর চলতেই থাকে। রাজনৈতিক গতিবিধি শুরু হয় কোনো নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। ব্যক্তিগত ভাবে যে সংগঠন করে এসেছি সেটা আমার ভালো লাগে। বর্তমানে রাজনীতি শিখতে হচ্ছে, শিখছিও। আর শেখার কোনো শেষ নেই। যেহেতু নির্বাচন এসে গেছে তাই রাজনীতির গতিবিধি, সভা-সমিতি, আন্দোলনের স্ট্রাটেজি তৈরি হচ্ছে। এগুলো নির্বাচনের অংশ।

■ **রাজ্য সভাপতি হওয়ার পর আইন অমান্য আন্দোলন ‘জেল ভরো’ কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। কতটা সফল সেই পদক্ষেপ?**

■ গত উপনির্বাচন এবং পুরসভার ভোটের পর থেকে আমাদের গ্রাফ একটু নামতে থাকে। আশানুরূপ ফল আমরা পাইনি। ফলে কর্মীদের মধ্যে হতাশা ঢিলেমি ভাব এসে গিয়েছিল। তাই জোর একটা ঝটকা দেওয়া দরকার ছিল। অনেকদিন ধরেই পরিকল্পনা চলছিল আইন অমান্য আন্দোলনের। তাই আমরা সেই কর্মসূচি গ্রহণ করি। কার্যকর্তারা কাজ করেছেন সেইমতো, আমি সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে পছন্দ করি। বেশকিছু জায়গায় আমি উপস্থিত ছিলাম। ‘জেল ভরো’ আন্দোলন যেখানেই হয়েছে সেখানে সাধারণ মানুষ দলে দলে যোগ দিয়েছে। এতে

প্রায় ১ লক্ষ ৪০-৪৫ হাজার লোক যোগদান করেছিল। তাদের গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। যা এই আন্দোলন সফল করতে সাহায্য করে। ৬০ জনকে জামিন অযোগ্য ধারায় কেস দেওয়া হয়। ১৫০ জন আহত, ৪৫ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়। ৩ জন কেন্দ্রীয় সম্পাদক আহত হন। ৬ জন প্রদেশের নেতা। এটা লড়াই করতে আরও উৎসাহ দিয়েছে। লড়াই করার মানসিকতা তৈরি হয়েছে।

বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিজেপির সাফল্যের সম্ভাবনা কতটা?

সাফল্য তো আসবেই। যে রাজনৈতিক পরিবর্তনে একসময় বিজেপির দিকে একটা স্রোত তৈরি হয়েছিল সেরকমই আবার চারিদিক থেকে লোকের সাড়া মিলছে। বিদ্বজ্জনদের ফোন আসছে। সাধারণ কর্মী, বিভিন্ন কার্যকর্তা-নেতা ছাড়াও অন্যান্য দলের বিধায়করা পর্যন্ত ফোন করছেন, চলচ্চিত্র জগতের অনেকেই দলে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি, শিক্ষাজগতের, শিল্পজগতের লোকেরা আগ্রহ প্রকাশ করছেন। এছাড়া বিভিন্ন জেলায় আমরা জেলা সভাপতি পরিবর্তন করেছি। অর্থাৎ সব মিলিয়ে আগামীদিনে বিজেপির সাফল্যের সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

রাজ্য সভাপতির আসনে বসেই জেলা সভাপতি বদলে তৎপর হলেন। আপনি কি মনে করেন আগে যারা ছিলেন তাঁরা জেলা সংগঠন মজবুত করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন বলেই এই রদবদল?

আমি দায়িত্ব নেওয়ার আগেই ৮টি জেলায় জেলা সভাপতি বদল হয়েছিল। ৩৩ টির মধ্যে ২৫টি জেলাতে সংবিধান অনুযায়ী তাদের মেয়াদ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তাই বদলের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তার সঙ্গে মনে হলো আরো বেশ কিছু জেলায় জেলা সভাপতি বদলের দরকার। তাতে দলের পক্ষেই ভালো। কারণ আন্দোলন করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে জেলাগুলিতে সভাপতি বদল হয়েছে সেখানে অধিক জনসমাগম হয়েছে। লোকের মধ্যে উৎসাহ দেখা দিয়েছে। সেইমতো আমরা তিনটি জেলা বাদ দিয়ে বাকি জেলাগুলি পরিবর্তন করেছি।

মালদার কালিয়াচকে যে ঘটনা ঘটল তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। কী বলতে চান এক্ষেত্রে?

বাংলায় যে মৌলবাদী শক্তি মাথাচাড়া দিয়েছে এবং তারা শক্তি সঞ্চয় করে পশ্চিম বাংলাদেশ তৈরির চক্রান্ত করছে, ঘটনাটি সেদিকে নির্দেশ করছে। কমলেশ তিওয়ারির উক্তি একমাস আগে হয়েছে। সারা ভারতে তার প্রতিক্রিয়া হয়েছে। প্রতিবাদ হতেই পারে। কিন্তু কালিয়াচক হচ্ছে গোরু-পাচার এবং জালনোট পাচারের করিডোর। যত উগ্রপন্থী এবং দেশবিরোধী শক্তির আড্ডা ওই জায়গায়। তাই এই সুযোগ নিয়ে বেশকিছু দুষ্কৃতকারী হামলা চালায়। রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির আড্ডায় পরিণত হয়েছে। সরকার কাপুরুষতার ও অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে। যাদেরকে গ্রেপ্তার করেছে তারা সম্পূর্ণ নিরাপরাধ ব্যক্তি। পাঠানকোট আর কালিয়াচক আলাদা কিছু নয়। দুটিই রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির চক্রান্ত।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাহাড় যাত্রা প্রায়ই করেন। কিন্তু চা বাগানের শ্রমিকদের যে মৃত্যু মিছিল চলছে সে ব্যাপারে নীরব তিনি। সরকারের পদক্ষেপ কতটা জোরালো হওয়া উচিত বলে মনে করেন?

সম্প্রতি পাহাড়ে গিয়ে তিনি বলেন, ৭৫ জনের বেশি যাঁরা মারা গেছে তারা কেউ চা-বাগানের কর্মচারী ছিল না। এটা বলে তিনি নিজের দায় সারতে চেয়েছেন। এখন যদি একটি চা-বাগান বন্ধ হয়ে যায়, সেখানে যদি ১ হাজার শ্রমিক কাজ করেন তাহলে ৫ হাজার মানুষ মারা যাবে। কারণ শ্রমিকদের পরিবারের লোক যেমন আছে তেমনই স্থানীয় দোকানপাঠ, বাজার-হাটের পরিস্থিতিও এদের উপর নির্ভর করে আছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজের অযোগ্যতাকে চাপা দেওয়ার জন্য মানবতার অপমান করছেন এ সমস্ত কথা বলে। এটা সারাজীবন ওনার চালাকি। জঙ্গলমহল হাসছে বলে প্রায়ই মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। আমার পৈত্রিক ভিটে জঙ্গলমহলে। কিরকম হাসছে তা আমি প্রায়ই গিয়ে দেখে আসি। মুখ্যমন্ত্রীর যেটা করা উচিত চা বাগানের ক্ষেত্রে তা করছে কেন্দ্র। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নির্মলা সীতারমন চা বাগানে গেছিলেন। এর তিন চার মাস আগেও তিনি এসেছিলেন। মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন কেন্দ্রের নীতির জন্য চা-বাগান ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। চা-বাগান সামলানো কেন্দ্রের দায়িত্ব নয়, এটা মূলত রাজ্যের দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালন না করে কেন্দ্রের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছেন।

বিরোধীদের অভিযোগ সারদাকাণ্ডে সিবিআই-কে দিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য নাকি মাঠে নেমেছে বিজেপি। কথাটা কতটা যুক্তিযুক্ত?

কথাটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কেউ বলছেন সিবিআই ঠিকমতো কাজ করছে না, কেউ বলছেন বেশি করছে। সিবিআই তার মতো কাজ করে, তারজন্য একটা প্রসিডিওর থাকে। তদন্তের স্বার্থে ডাকতে পারে, জিজ্ঞাসা করতে পারে কিন্তু কাউকে গ্রেপ্তার করা, কেস দেওয়া সম্পূর্ণ প্রমাণ সাপেক্ষ। এক্ষেত্রে কেন্দ্র কোনো হস্তক্ষেপ করে না।

আগামী বিধানসভা নির্বাচনে আপনাদের রণকৌশল কী?

রণনীতি নিয়ে বৈঠক চলছে। বিভিন্ন চিন্তাভাবনা রয়েছে আমাদের। রণনীতি তৈরি হচ্ছে। এই সরকারের ব্যর্থতা, ভুল ভ্রান্তি, জনবিরোধী কাজের কথা তুলে ধরাটাই প্রথম কাজ আমাদের। তার মধ্যে মুখ্য বিষয় চিটফান্ড, সুরক্ষা, বাংলার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার— ভোট দিতে না দেওয়া, পুলিশকে রাজনৈতিক কাজে লাগানো। এগুলিই আমরা তুলে ধরতে চাই।

রাজ্য সভাপতি হিসাবে দলের কর্মীদের প্রতি কি বার্তা দিতে চান?

প্রথম এসেই আমি বার্তা দিয়েছি লড়াই করতে হবে রাস্তায় নেমে। আমি নিজে দাঁড়িয়েছি। আমিও পুলিশের লাঠি খেয়েছি। আর এই বার্তাটা গ্রহণ করেছেন আমাদের কর্মীরা। তাঁদের কথায় এবং কার্যক্রম সাফল্যে আমরা এটা দেখতে পেয়েছি। রাজনৈতিক ব্যক্তি জনগণের স্বার্থে রাস্তায় নেমে লড়াই করবে এবং সুশাসন দেবে এটাই লোকে আশা করে। সেদিকেই আমরা এগোচ্ছি।

গঙ্গাসাগরের একটুকরো ছবি কলকাতার বাবুঘাটে

শুভাশিস রায়

পশ্চিম আকাশে সূর্য প্রায় অস্তাচলে। সন্ধ্যা নামার পালা। গঙ্গাসাগর উপলক্ষে উপচে পড়া ভিড় প্রিন্সেপ ঘাট লাগোয়া মাঠে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাধু-সন্তের দল যেমন আসছে তেমনি পুণ্যার্থীরাও ভিড় জমাতে শুরু করেছে বাবুঘাট চত্বরে। কাতারে কাতারে লোক যে যার মতো করে আশ্রয়স্থল খুঁজে নিয়েছে। সেজে উঠেছে নাগা সন্ন্যাসীদের এক একটি অস্থায়ী আখড়া। অতিথি ভক্তের উদ্দেশে ছিলিম এগিয়ে দিচ্ছেন সাধু-সন্তরা। অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন ঘরের পুরুষ-মহিলারা তাঁদের কাছে জানতে চাইছেন ভবিষ্যতের কথা। অর্থাৎ সব মিলিয়ে অন্যান্য বছরের মতো এ বছরেও একটুকরো গঙ্গাসাগর মেলা দেখা যাচ্ছে কলকাতার বাবুঘাট চত্বরে।

মকরসংক্রান্তি উপলক্ষে গঙ্গাসাগর মেলা হয়ে থাকে। এদিন মকররাশি প্রাণসৃষ্টিকারী সূর্যের কাছে চলে আসে। পৃথিবী দক্ষিণায়ন সমাপ্ত করে উত্তরায়ণের সূচনা করে। তাই এই সংক্রান্তিকে মকরসংক্রান্তি বলা হয়। এ সময় নাকি স্বর্গের সকল দেবতা নিদ্রামগ্ন অবস্থায় থাকেন। পৌষ মাস যেহেতু মলমাস তাই মাঘকে শাস্ত্রে শুভ কাজের পক্ষে ভালো বলা হয়েছে। তাই মকরসংক্রান্তিতে সাগরদ্বীপ সেজে ওঠে উৎসবের মেজাজে। পুণ্যস্নানের পাশাপাশি গঙ্গাসাগর মেলা প্রাঙ্গণও উপভোগ করার মতো। তবে সাগরদ্বীপের প্রবেশদ্বার কিন্তু কলকাতার বাবুঘাট চত্বর। যেখানে বেশ কিছুদিন আগে থেকেই পসরা সাজিয়ে বসেন সাধু-সন্ত থেকে পুণ্যার্থীগণ। ব্যতিক্রম নয় এবছরও।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তরের (পি এইচ ই) পক্ষ থেকে কলকাতার বাবুঘাটে সাধু-সন্ন্যাসী এবং পুণ্যার্থীদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাধুদের জন্য অস্থায়ী আখড়া গড়ে তোলা হয়েছে। বাঁশের খুঁটি এবং টিনের ছাউনি বিশিষ্ট এক একটি আখড়ার সামনে চুল্লির ব্যবস্থা আছে। যাতে প্রয়োজনে সেটি রান্নার কাজে লাগে বা হোমকুণ্ড হিসাবে ব্যবহার হতে পারে। সারা প্রাঙ্গণ জুড়ে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে পুণ্যার্থীদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মূলত সরকারের পক্ষ থেকে সাধু-সন্তদের জন্য আলাদা আলাদা থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। প্রাঙ্গণে পানীয় জল, শৌচাগারেরও ব্যবস্থা আছে। অন্যান্য বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রাঙ্গণ জুড়ে অগুনতি সেবা শিবির গড়ে উঠেছে। সেখানে ২৪ ঘণ্টা পানীয় জল, চিকিৎসক, থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত রয়েছে। কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে অস্থায়ী অনুসন্ধান অফিসও গড়ে তোলা হয়েছে। মাঠ প্রাঙ্গণে সিসিটিভি ক্যামেরা, অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা, বোম্ব স্কোয়াড, স্নিফার ডগও উপস্থিত রয়েছে। যাতে কোনোরকম চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ নিতে পারে। তবে প্রাঙ্গণের স্বচ্ছতা কতটা বজায় থাকবে সেটাই দেখার। কারণ নোংরা-আবর্জনাস্তূপ ইতিমধ্যেই গ্রাস করেছে প্রাঙ্গণের একটি অংশ।

এবারে প্রাঙ্গণের অস্থায়ী আখড়ার সংখ্যা ছিল ২৫৪টি। মূলত উত্তর ও মধ্য ভারতের হরেক আখড়া থেকে এসেছিল সাধুসন্তের দল। শ্রী পঞ্চ দশনম জুনা আখড়া বাবা

With Best
Compliments
From :-

Punjab Glass Depot

P. K. GOENKA
BUSINESS MENTOR

Birla Sun Life Insurance Company Limited

2, Cilve Ghat Street
(Sagar Estate) Ground Floor,
Unit No. 22, Kolkata - 700 001
www.birlasunlife.com

Office : 033-22304784

Mobile : 9830029558
E-mail : pk_goenka@vsnl.net

Rang Rez Sarees

Wholesalers of Fancy Printed & Embroidered Sarees

45/1, Rafi Ahmed Kidwai Road
(Entrance also from 77/1/A, Park Street)
2nd floor, Kolkata - 700 016

PHONE : 2265-9147, 2265-0772 (Shop),

for Designer Super Net Sarees

পশুপতি নাথ খাঁ শেরাবালি মন্দিরের সাধু মহন্ত শ্রী দয়ালগিরি নাগাবাবা। কাশী বেনারসের এই নাগাবাবা ময়দানের ‘চা-বাবা’ নামে খ্যাত বলে জানা যায়। কারণ তাঁকে দর্শন করতে যেই যান তাদের সকলকে নিজের হাতে চা বানিয়ে পরিবেশন করেন। সঙ্গে ফলমূলও। তাই হুজুগে দর্শনার্থীদের ভিড় স্বভাবতই তাঁর দিকে। এসেছেন অসমের গুয়াহাটির কামাক্ষা বগলামুখী আশ্রমের শ্রীশ্রী অবধূত লঙ্কর বাবা। যার কাছে আবার হোম-যজ্ঞ সহকারে কুষ্ঠি বিচার করাচ্ছেন একদল পুরুষ মহিলা। বাবার পাশে বসে তাঁর পোষ্য সারমেয় ল্যাব্রাডর। এখানে উপস্থিত হয়েছেন রাজ্যের একাধিক সাধু-সন্ত। সুন্দরবনের লালবাবা নামে খ্যাত নন্দলালগিরি। হাওড়ার শিবপুরের মহন্ত শ্রীরবীন্দ্রানন্দ গিরিমহারাজ। তবে পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় অন্যান্য রাজ্যের নাগাসন্ন্যাসীদের ভিড় উপচে পড়েছে সাগরতীর্থে। কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাট আবাহন আখড়ার মহন্ত উত্তরানন্দ গিরি নাগাবাবার সঙ্গে কথা বলে জানা যায় এই সাগরতীর্থে আসার জন্যে সাধু-সন্তরা অপেক্ষায় থাকেন বছরভর। শীতের হিমেল হাওয়ায় বালিয়াড়ির উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সঙ্গমে সূর্যোদয় অথবা সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে আদিগন্ত জলসীমায় পৌঁছে যান পুণ্যার্থী থেকে সাধু-সন্তের দল। উদ্দেশ্য সাগরতীর্থে থাকলেও একাধিক সাধু-সন্তের মন কিন্তু বর্তমানে রামমন্দিরের দিকে। রামমন্দির প্রসঙ্গে তাঁদের সকলেরই মত ‘রামমন্দির হামারা থা, ইসলিয়ে মন্দির বানানা চাইয়ে।’

সাগর তীর্থযাত্রীদের জন্য যেসব অস্থায়ী সেবা শিবির গড়ে উঠেছে তা অবশ্য লক্ষণীয়। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে সেবা শিবির রয়েছে প্রাঙ্গণ চত্বরে। গত ১০ জানুয়ারি এই শিবিরের উদ্বোধন হয়। পরিষদের শিবিরে বহু সাধু সন্ত ও পুণ্যার্থীগণকে ভিড় করতে দেখা যায়। এছাড়াও সুলতানপুর সমাজ, কলকাতা ভূকৈলাশ ওয়েলফেয়ার সেন্টার, জৌনপুর নাগরিক সঙ্ঘ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, রামকৃষ্ণ মিশনের মতো আরও বহু সংগঠন হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সাগরতীর্থ যাত্রীদের জন্য। গঙ্গাতীরের বাবুঘাট মেলার চেহারা নিয়েছে দেখার মতো। বাবুঘাটের মিনি গঙ্গাসাগরে বিক্রি হচ্ছে খাঁটি রুদ্রাক্ষ। যিনি বিক্রি করছেন

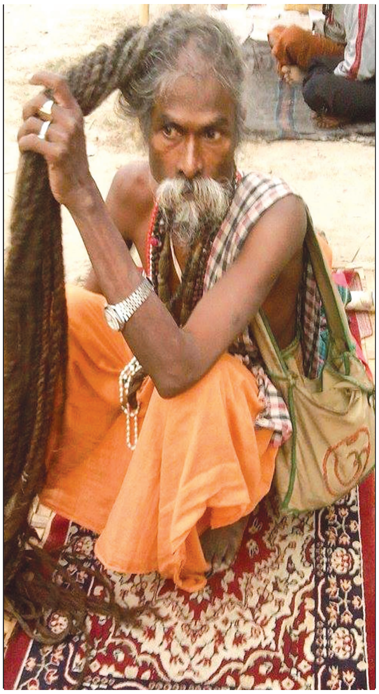

তাঁর কথায় একেবারে খাঁটি জিনিস। আবার কেউ বিক্রি করছে যৌবন ধরে রাখার মন্ত্রৌষধি।

গঙ্গাসাগর উপলক্ষে যে উৎসব আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে তা একজন হিন্দু নাগরিকের মনে অনেকটা স্থান জুড়ে রয়েছে। সকলের জানা উচিত উৎসব উপলক্ষে যে মেলা হয় আসলে তা কী? মূলত উৎসব ও মেলা যেন হরিহর আত্মা। উৎসব আছে মেলা নেই তা কখনই হতে পারে না। তীর্থযাত্রা, তীর্থ দর্শন, তীর্থপতির পূজা এক পবিত্র কর্ম। তাই তীর্থযাত্রাকে ‘Expression of love for the motherland’ বলা হয়। তীর্থযাত্রার মতো উৎসবকে উপলক্ষ্য করেই মেলার সৃষ্টি। মেলা কথার অর্থ মিলন স্থল। যে মিলন স্থলে অনাত্মীয় আত্মীয়তার সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। বিশেষ করে গঙ্গাসাগর মেলার ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে অপার কৌতুহল এবং বিস্ময় চোখে পড়ে। কথায় আছে ‘সব তীর্থ বার বার গঙ্গাসাগর একবার’। গুজরাটি, মারাঠা, বাঙালি, বিহারি, রাজস্থানী, তামিল-তেলুগু সকলে একসঙ্গে মিলিত হয়। সকল ভারতবাসী যেন একটি পরিবারের মধ্যে এক সূত্রে বাঁধা পড়েছে বলে মনে হয়। অর্থাৎ তীর্থস্থলের উদ্দেশে যখন সকলে সমবেত হয়ে চলতে থাকে তখন মনে হয় আজ আমি একা নই। আমার সঙ্গী সারাদেশ। সেক্ষেত্রে গঙ্গাসাগরের মতো তীর্থযাত্রা হলে তো কথাই নেই। গঙ্গাসাগরের মেলায় খণ্ড ভারত দর্শন করা যায়। খণ্ডের মধ্য দিয়ে অখণ্ডের দেখা।

উল্লেখ্য, গঙ্গাসাগর নিয়ে প্রচলিত আছে এক পুরা কাহিনি। অযোধ্যার সূর্যবংশের পরাক্রান্ত রাজা সগর নিরানব্বই অশ্বমেধ যজ্ঞের পর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন শততম যজ্ঞে। এই যজ্ঞ সম্পূর্ণ করতে পারলে তিনি স্বর্গরাজ ইন্দ্রের সমপর্যায়ে উন্নীত হবেন। কিন্তু ইন্দ্র সগররাজার শততম যজ্ঞ পণ্ড করতে যজ্ঞের ঘোড়াটি অপহরণ করে লুকিয়ে রাখলেন। সগরের ষাট হাজার পুত্র বহু খোঁজের পর যজ্ঞাশ্বের সন্ধান পেলেন মহর্ষি কপিলের নির্জন সাধন ক্ষেত্রে, যেখানে মহামুনি গভীর ধ্যানে মগ্ন। কাজটি কপিলদেবের মনে করে রাজপুত্ররা তাঁর দেহে আঘাত করে বসলেন। ঘটনার এই আকস্মিকতায় মহর্ষির কোপানলে পড়ে মুহূর্তেই তাঁরা ভস্মীভূত হলেন। এরপর সগররাজের পৌত্র ভগীরথ কঠোর তপস্যায় গঙ্গাকে মর্ত্যে নিয়ে এলেন। তাঁর পুণ্য স্পর্শে শাপমুক্ত হলেন সগরনন্দনরা। গঙ্গা ও সাগরের সঙ্গমস্থল পরিণত হলো তীর্থক্ষেত্র গঙ্গাসাগরে। সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হলো কপিলমুনির আশ্রম। গঙ্গাসাগরে বর্তমানে কপিল মুনির মন্দিরটি বাংলা ১৩৮০-৮১ সনে নির্মিত হয়। এর পূর্বে বহুবার বিভিন্ন স্থানে মন্দির নির্মিত হলেও সমুদ্র গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। শোনা যায়, সবচেয়ে প্রাচীন মন্দিরটি ইং-৪৩৪ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়। মন্দিরে বিগ্রহ বলতে কপিলমুনি, গঙ্গাদেবী, সাধক রাজা ভগীরথ ও বীর হনুমানের। অযোধ্যার হনুমানগড়ী মঠের রামানন্দপন্থী সাধুরা এই মন্দিরের মালিক ও নিত্যসেবক, পূজারি। অতীতে এই তীর্থ মানুষের কাছে অতি অগম্য ছিল।

জানা যায়, মুঘল আমলের জরিপি চিঠায় হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগরে আসার জন্য আদি গঙ্গার তীর বরাবর দ্বারির জাঙ্গাল নামে তীর্থযাত্রীর জন্য সড়ক ছিল। আজ তা অনেকটাই সহজ হয়েছে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠায়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, কুম্ভমেলার পর দেশের বৃহত্তম মেলা গঙ্গাসাগর। মকর সংক্রান্তির দিন পুণ্যস্নান করেন লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী। ■

প্রেরণার পাথেয়

'কেবল কোনো ভূমিখণ্ডকে রাষ্ট্র বলে না। এক চিন্তাধারা, এক আচার, এক সভ্যতা এবং এক পরম্পরা লইয়া যে সকল লোক প্রাচীনকাল হইতে একসঙ্গে বসবাস করিয়া আসিতেছে তাহাদিগকে লইয়াই এক রাষ্ট্র গঠিত হয়। আমাদের জন্যই এই দেশের নাম হিন্দুস্থান হইয়াছে। অন্য লোকেরা যদি এখানে থাকিতে চায়, থাকুক আমরা কখনও তাহাতে আপত্তি করি নাই বা করিবও না। পারসী সমাজের উদাহরণের দ্বারাই আমরা হিন্দুদের এই উদারতার পরিচয় পাই। কিন্তু যাহারা আমাদের ঘরে অতিথি লইয়া আসিবে অথচ আমাদেরই গলায় ছুরি বসাইতে উদ্যত হইবে, তাহাদের জন্য এখানে এক ছটাক ভূমিও নাই।'

(সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ারের বাণী থেকে)

'প্রাচীন ভারতে, যুবসম্প্রদায় এবং ছাত্রদের পক্ষে জাতীয় ভাবধারা অব্যাহত রাখতে যে ব্রহ্মচর্য অপরিহার্য, তার অনুশীলন অপেক্ষা সুন্দর বিষয় আর কিছু ছিল না। সেটাই ছিল উচ্চ জাতীয় আদর্শ, যার লক্ষ্য ছিল আধ্যাত্মিকতা ও শক্তিলাভ'।

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

সাংবাদিক বন্ধুদের জন্য

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধু,

আপনি নিশ্চয়ই গত ৩ জানুয়ারি মালদা জেলার কালিয়াচক থানার ঘটনা শুনেছেন। একদল মৌলবাদী উত্তরপ্রদেশের এক নেতার বক্তব্যের প্রতিবাদ করতে এসে পুলিশ-থানা পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। পুলিশ, বিএসএফ ও সেইসঙ্গে নিরীহ মানুষের মোট ১২টি গাড়ি পুড়িয়েছে। থানা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র লুঠ হয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ ফাইল পোড়ানো হয়েছে। পুলিশকর্মীরা কেবল নিজেদের প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বেঁচেছেন। সীমান্তবর্তী কালিয়াচক থানার বিস্তীর্ণ এলাকা ক'দিনের জন্য ছিল কোনোরকম প্রশাসন ছাড়াই। সেদিন ওই মৌলবাদীরা পাশের হিন্দুপাড়া আক্রমণ করেছে। অবাধে চলেছে লুটতরাজ। গুলিবিদ্ধ হন দু'জন নিরীহ গ্রামবাসী।

কলকাতার প্রায় কোনো সংবাদমাধ্যমেই এখবর প্রকাশিত হয়নি বললেই চলে। এই প্রসঙ্গে আমার কিছু প্রশ্ন—

১। কালিয়াচকের ঘটনা স্পর্শকাতর, সেজন্যই কি এটি প্রকাশিত হলো না? দাদরির ঘটনা, আমেদাবাদ দাঙ্গার বিবরণ প্রথম পাতায় এসেছিল। পাতা জুড়ে উত্তরসম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল। এ বিষয়ে নীতিবোধটা ঠিক কী?

২। একটা থানা লুঠ হয়ে গেল। কতগুলি নথি, কেসের ডাইরি- সিডি, গোয়েন্দা রিপোর্ট পুড়েছে? মালখানা থেকে কতগুলি রাইফেল চুরি গেছে? কতগুলি ফেরত এসেছে? এসব মানুষ জানবে না? থানা লুঠ তো দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এই পরিকল্পনার গোয়েন্দা রিপোর্ট ছিল কিনা, সেটা দেশের নাগরিকরা অবগত হবে না? যে থানা এলাকা জালনোট, আফিং চাষ, চোরাচালান ও অনুপ্রবেশের জন্য সব সময় সংবাদের শিরোনামে থাকে, সেই থানা লুঠ হওয়ার পর এলাকায় প্রশাসন কীভাবে চলল? এটা গুরুত্বপূর্ণ নয়? যখন দেশের পশ্চিম সীমান্তে পাঠানকোটের মতো ঘটনা ঘটছে, তখন পূর্ব সীমান্তের এই ঘটনা কী ভয়াবহ নয়?

৩। ২০০১ সালে বাংলাদেশে ভয়াবহ নরসংহারের প্রায় কোনো খবর প্রকাশিত হয়নি বাংলা প্রচারমাধ্যমে। ২০১০ সালে দেগঙ্গার দাঙ্গা, গত বছর ১৪ এপ্রিল নদীয়ার জুরানপুরে ৩ জন নিরীহ তপশিলি প্রান্তিক কৃষকের নির্মম হত্যা, গত ২, ৩, আগস্ট রাজাবাজার অবরোধ এবং সবশেষে কালিয়াচকের এই সাংঘাতিক ঘটনা— কোনোটাই কাগজে আসেনি। হিন্দুরা যেখানে আক্রান্ত সেখানেই কলকাতার সংবাদজগৎ মুক ও বধির। কেন?

৪। ১৯৪৭ সালের ২০ জুন অখণ্ড বাংলার আইনসভা ভেঙে পশ্চিমবঙ্গের জন্ম হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ পন্থনিরপেক্ষ, স্বাধীন চিন্তার স্থান হবে এমনটাই আশা ছিল আমাদের রাজ্যবাসীর। কিন্তু ক্রমশ পশ্চিমবঙ্গ সেই চরিত্র হারাচ্ছে। বিগত বছরগুলিতে মালদা, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, নদীয়া বা দুই ২৪ পরগনার ঘটনা এক নিশ্চিত অশুভ ইঙ্গিত দিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ দ্রুত চরিত্রগতভাবে পশ্চিম বাংলাদেশ হয়ে যাচ্ছে না তো?

৫। যদি তাই হয়, তবে আজকের প্রযুক্তিবহুল যুগে বর্তমান সময়ের অনুপুঙ্খ হিসেব থাকবে আগামী প্রজন্মের হাতে। ২০১৬ সালে ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক দলের নিয়ামক ব্যক্তি কারা ছিলেন? বিরোধী শক্তির প্রকৃত অবস্থান কী ছিল? সামাজিক এবং ধর্মীয় সংগঠনের ভূমিকা, সবকিছুই লেখা হবে কয়েক বছর পরে। সেই সঙ্গে বড় থেকে ছোট সব সংবাদমাধ্যমের নাম, প্রকাশক গোষ্ঠী, মুখ্য সম্পাদক, বিভাগীয় সম্পাদক, ব্যুরো চিপ, সামাজিক-প্রশাসনিক- রাজনৈতিক খবরের প্রিন্সিপাল করসপন্ডেন্ট সকলের নামও পরিষ্কার ভাবে থাকবে আসছে দিনের ইতিহাসে। পশ্চিমবঙ্গের চরম বিপদের দিনে সংবাদজগতের ঠিক কে কী ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাও জানবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। সেটা কি এখনকার বাণিজ্যিক লাভ, চাকরির উন্নতি, রাজনৈতিক বদান্যতা এসবের থেকে অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়?

আপনারা প্রবুদ্ধজন। সংগঠনের কাজ করার সুবাদে আপনাদের সঙ্গে পরিচয় ও বন্ধুত্ব। সেই অধিকারেই আমি এই প্রশ্নগুলি রাখলাম। আপনাদের কাজে কোনোরকম অভিমত দেওয়ার অভিপ্রায় আমার নেই। এগুলি কেবল প্রশ্নই। সময় সুযোগ মতো প্রচারমাধ্যমে বা ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় উত্তর পেলে বাধিত হব। ধন্যবাদান্তে,

জিষ্ণু বসু,
প্রান্ত কার্যবাহ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, দক্ষিণবঙ্গ।

নাবালকের মুক্তি

দিল্লী হাইকোর্ট রিমান্ড হোম থেকে নির্ভয়ার নাবালক ধর্ষণকারীকে মুক্তি দিয়েছে। যুক্তি একটাই ধর্ষণকারী নাবালক। খবরে প্রকাশ, অপরাধ করবার সময় আঠারো বছর হতে কয়েকমাস বাকি ছিল। কাজেই অপরাধ করেও সে নিরপরাধ।

প্রশ্ন এখানে, যে ধর্ষণ করতে পারে সে নাবালক হয় কি করে? আমরা পূর্ণ বয়স্ক প্রত্যেকেই বয়ঃসন্ধিক্ষণ পেরিয়ে এসেছি। গড়পড়তা চোদ্দ পনেরো বছর বয়স থেকে ছেলেরা সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা অর্জন করে। সেই সময় একধরনের বয়ঃসঙ্কট দেখা দেয়। পারিপার্শ্বিক বাতাবরণ অনুকূলে থাকলে ছেলেরা সংযত হয়। প্রতিকূল বা অসৎ সঙ্গে ছেলেরা বখে যায়, ডেঁপো অকালপক্ক হয়ে ওঠে। বিশেষত সতেরো বা আঠারো ছুঁই ছুঁই বয়সের তথাকথিত নাবালক ছেলেরা সমাজের এহেন জঘন্য কাজ নেই যা করতে পারে না। যেকোনো জঙ্গি সংগঠনের বড় একটা অংশ এই বয়সের মধ্যেই থাকে। নির্ভয়া কাণ্ডের নৃশংস অপরাধীকে যে যুক্তিতে মুক্তি দেওয়া হলো সেটা অবিবেচকের বিচার ছাড়া আর কিছু নয়।

নৃ-বিজ্ঞান বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে মানুষের শারীরিক গঠন ও মানসিক গড়নের উপর নির্ভর করে প্রাপ্ত বয়স্কতা আগে আসবে না পরে আসবে। পনেরো থেকে আঠারোর মধ্যে অনেক ছেলেরই ধর্ষণেচ্ছা মারাত্মক আকার ধারণ করে। সংবাদপত্র

With Best
Compliments :

**R. C. BHANDARI
(HUF)**

8, Camac Street

36, Basement

Kolkata - 700 017

**OMEX (INDIA)
SALES PVT. LTD.**

Earth Moving, Mining, Auto &
General Machinery Spares

6, Mangoe Lane, 2nd Floor,
Kolkata - 700 001

Phone : 2210-3267, 2248-0761

Fax : 22102969,

E-mail :
omexindi@cal2.vsnl.net.in

With Best Compliments From :-

Hommage Commercial
Private Limited

MEM

M. E. M. INDUSTRIES

AN ISO 9001 : 2008 Company

e-mail : cables@memindustries.com
Poddar Court, Gate no. 4, 2nd floor,
18, Rabindra Sanani,
Kolkata-700 001,
Phone : 22357998, 22352996,
Telefax : 033-22351868

OUR RANGE

- Compensating Cables
- High Temperature Cables
- Instrumentation Cables
- Trailing Rubber Cables
- Control & Frls Cables
- Thermocouples & RTD

**Also Sole Distributor
BELDEN (USA)Cables.**

খুললেই এই বয়সের ছেলেদের কুকীর্তি চোখে পড়ে। আশেপাশেও ঘটতে দেখি অহরহ।

এই নাবালক অপরাধীর শাস্তির দাবিতে ভারতবর্ষ যে উত্তাল হয়ে উঠেছে তার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে।

অপরাধী ছেলেটি মুক্তি পেয়ে বর্বর হয়ে উঠবে, না কি অনুশোচনায় পরবর্তীতে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে—সেটা প্রশ্ন নয়। ভয় অন্যখানে এবং সেটা সমাজে মারাত্মক প্রভাব ফেলবে। পনেরো থেকে আঠারো বছরের ছেলেরা সাঙ্ঘাতিক রকমের সচেতন ও বুদ্ধিমান। ভারতের বিচার ব্যবস্থাটা যদি একবার ওদের মাথায় ঢুকে যায় যে, আঠারো বছরের একদিন কম হলেই ধর্ষণ করলে কোনোরকম শাস্তি হবে না। তখন কী ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি হবে। ভেবে দেখুন।

—**অশোক কুমার ঠাকুর,**
বানেশ্বর, কোচবিহার।

মুর্শিদাবাদে ব্রাত্য হিন্দু সংস্কৃতি

মুর্শিদাবাদ নাম শুনলেই সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে ভেসে ওঠে হাজারদুয়ারি। মুর্শিদাবাদ নবাবের দেশ। একদা বাংলা, বিহার ও ওড়িশার রাজধানী। পর্যটকেরা যখন মুর্শিদাবাদে আসেন তখন প্রাচীন নবাবদের সাংস্কৃতিক নিদর্শন দেখেই ঘুরে চলে যান। মুর্শিদাবাদ সংক্রান্ত যে কোনো পুস্তকে শুধুই নবাবি সংস্কৃতির আলোচনা। অথচ বহু প্রাচীন এই জেলার হিন্দু সংস্কৃতিগুলি মানুষের কাছে অজানাই থেকে যায়। চেনা মুর্শিদাবাদের এই অচেনা হিন্দু সংস্কৃতি যেন আলোচনার বাইরেই থেকে যায়। একজন মুর্শিদাবাদবাসী হিসেবে এটি আমাদের কাছে বড়ই বেদনাদায়ক।

মুর্শিদাবাদ জেলার সদর শহর বহরমপুর। শহরের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ভাগীরথী নদী। এই নদীর গতিপথ বর্তমানে পরিবর্তিত হয়েছে। প্রাচীনকালে বা মধ্যযুগেও এই নদীর গতিপথ শহরের মাঝখান দিয়ে ছিল। নদীর এক প্রান্ত যা বর্তমানে খাগড়া অঞ্চল তার আদি নাম ছিল ব্রহ্মপুর। ব্রহ্মপুর আজ হয়ে গেছে বহরমপুর। নদীর অপর প্রান্তের নাম ছিল বিষ্ণুপুর। অঞ্চলটির নাম বর্তমানে মধুপুর হলেও বিষ্ণুপুর কালিবাড়ি নামটি আজও আছে। অপর একটি অঞ্চলের নাম ছিল ব্যাসপুর বা শিবপুর। যা বর্তমানে কাশিমবাজার। ব্যাসপুর শিবমন্দির নাম আজও প্রচলিত আছে। অর্থাৎ প্রাচীন এই শহর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নামের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। হিন্দু সংস্কৃতির এত সুন্দর নিদর্শন আর কোথায় আছে?

এই জেলার কাশিমবাজার রাজাদের অবদান হয়তো অনেকেরই জানা নেই। জেলার শিক্ষার বিকাশে এই হিন্দু রাজাদের অবদান চিরস্মরণীয়। বহরমপুর শহরের কৃষ্ণনাথ কলেজ ১৬০ বছর আগে এই রাজাদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত। জেলার বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় এই রাজবাড়ির উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। এছাড়াও কলকাতার কিছু কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও এই রাজবংশ তাদের অবদান রেখে গেছে।

এই জেলায় জিয়াগঞ্জ থানার অন্তর্গত বরানগরের রানী ভবানীর রাজবাড়ি একটি উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান। এখানকার শিব মন্দির ও মন্দিরের টেরাকোটার কাজ দেখার মতো।

এই জেলার সারগাছির রামকৃষ্ণ মিশন একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভাই স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজ এই রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজী এই আশ্রমেই অখণ্ডনন্দজীর কাছে দীক্ষা নেন। স্বামী অখণ্ডানন্দজীর নির্দেশেই শ্রীগুরুজী ডাঃ হেডগেওয়ারের চারাগাছ আর এস এস-কে মহীরুহে পরিণত করেন।

মুর্শিদাবাদ (লালবাগ) শহরের গঙ্গার এপারে কিরীটেশ্বরী একান্ন পীঠের অন্যতম। এখানে মায়ের কিরীট পতিত হয়েছিল। বহরমপুর শহরে বহু মহাপুরুষের আগমন হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই জেলার লালগোলার গঙ্গার পারে বসে 'বন্দে মাতরম্' রচনা করেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও মহাত্মা গান্ধীর এই শহরে আগমন হয়। মাস্টারদা সূর্যসেন, নলিনী বাগচীর মতো স্বাধীনতা সংগ্রামী এই জেলার কৃষ্ণনাথ কলেজে অধ্যয়ন করেন। এছাড়াও এই জেলার বহু হিন্দু সংস্কৃতির ঐতিহ্য আছে যা স্বল্প লেখায় উল্লেখ সম্ভব নয়।

পরিশেষে এইটুকুই অনুরোধ করবো এই জেলার নবাবি নিদর্শন দেখতে আসার সময় একটু সময় করে আসুন ও দেখে যান জেলার সুপ্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতির নিদর্শনগুলিও।

—**রাহুল চক্রবর্তী,**
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

আমি হিন্দু

সর্বশক্তিময়ী জগজ্জননীর কাছে সব কিছু বাদ দিয়ে বিবেকানন্দ 'আমায় মানুষ কর' এই প্রার্থনা করেছিলেন। দুটি হাত, দুটি পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেই মানুষ হওয়া যায় না তা বোধহয় এর পূর্বে কেউ এত ভাল করে বোঝাতে পারেনি। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মানুষ তৈরির যে যজ্ঞ স্বামী বিবেকানন্দ শুরু করেছিলেন তা আজও চলেছে। এখন ভারতে কমবেশি করে দেড়শো কোটি লোক হবে। দেড়শো কোটি লোকের মধ্যে মানুষ ১ শতাংশও নয়। আজ যদি দেড়শো কোটি লোক মানুষ হোত তাহলে নিজের ভালটা, নিজেদের ভালটা, নিজেদের ঘরের ভালটা নিজেরা বুঝত। সদর্পে বিবেকানন্দের অমোঘ শাশ্বত বাণীকে অনুরণন করে বলত— 'আমি হিন্দু।' আর এস এস প্রধান মোহন ভাগবত ঘরবাপসি শব্দটা প্রয়োগ করে সেই ধারাকেই বোধহয় একটু এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা করেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সারা পৃথিবী ঘুরে বিবেকানন্দ একমাত্র বুঝেছিলেন কলিযুগে সব আছে মানুষ নেই। তাই তিনি খুব সুন্দরভাবে বলেছিলেন— 'গর্ব করে বল আমি হিন্দু'। হিন্দু মানে প্রকৃত মানুষ, সমস্ত হিন্দু নামধারীরা মানুষ নয়।

—**অরবিন্দ পাত্র,**
বেহালা, কলকাতা-৩৪।

বিলুপ্ত তীর্থক্ষেত্র
গঙ্গাবাস

গোপালকৃষ্ণ রায়

শৈবতীর্থ শিবনিবাস কোনো রকমে টিকে থাকলেও গঙ্গাবাসের হরিহর মিলনতীর্থের গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটেছে অনেককাল আগেই। এই দু'টি তীর্থক্ষেত্রই নদীয়া জেলায়। তীর্থস্থান দু'টি স্থাপন করেছিলেন অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী শ্রীমান মহারাজ রাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র রায়। ১৭২৮ সালে নদীয়া রাজসিংহাসনে বসে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র যে কাজটি করেছিলেন সেটি হলো একটি মহাযজ্ঞ। অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী। এই মহাযজ্ঞের জন্য তৎকালে খরচ হয়েছিল কুড়ি লক্ষ টাকা। শুধু বঙ্গদেশের মহাপণ্ডিত ও বিদ্বজ্জনেরাই সেই মহাযজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন না— বারাণসীর পণ্ডিতবর্গের উপস্থিতিতে সেই 'অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী' মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যজ্ঞ শেষে সম্মিলিত পণ্ডিতগণ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে 'অগ্নিহোত্রী' বাজপেয়ী উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

অষ্টবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশের ইতিহাসের অন্যতম নায়ক মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বিচক্ষণ ও চতুর রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন না— শিক্ষা- সংস্কৃতি ও সাহিত্যের অনন্য পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। খেলাধুলো ছাড়াও মৃগয়াভিলাষী ছিলেন তিনি। ঘোড়া ও হাতির পিঠে চড়ে মাঝে মাঝেই মৃগয়ায় যেতেন তিনি। এই মৃগয়ায় গিয়েই তিনি একটি স্থান আবিষ্কার করেছিলেন। নিজেই সেই স্থানের নামকরণ করেছিলেন— 'শিবনিবাস'। তিনদিকে নদীবেষ্টিত নিসর্গ সৌন্দর্যে শোভিত স্থানটিতে একটি নতুন নগরী স্থাপন করেছিলেন। যদিও আমরা জানি স্বচ্ছসলিলা নদীর নাম চূর্ণী। মহারাজ সেই নদীর নাম দিয়েছিলেন 'কঙ্কনা'। 'কঙ্কনা' এখন আর নেই। ডিস্ট্রিক গেজেটিয়র ও নদীয়া কাহিনিতে কঙ্কনা নামটির উল্লেখ আছে।

তদানীন্তন ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র শুধু নিসর্গ দৃশ্যে মোহিত হয়ে স্থানটি নির্বাচন করেননি, রাজ্যের সুরক্ষার চিন্তাও তাঁর মাথায় ছিল। তিনদিকে নদী থাকায় প্রাকৃতিক সুরক্ষা তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন। অষ্টবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্থানটিতে তিনি একটি সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করেন। সেই সময়ে প্রাসাদের সঙ্গে প্রায় সংলগ্ন একটি বৃদ্ধাশ্রম ও একটি অক্ষমআলয়ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আজ আমরা যাকে প্রতিবন্ধী আবাস বলি, প্রায় তিনশো বছর পূর্বে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এমনই একটি প্রতিবন্ধী আবাস শিবনিবাসে গড়ে তুলেছিলেন। নাগরিকদের শিক্ষার জন্য স্থাপন করেছিলেন কয়েকটি পাঠশালা ও টোল। সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁর ছিল গভীর শ্রদ্ধা। সংস্কৃত ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল মহারাজা বহু সংস্কৃত পণ্ডিতকে শিবনিবাসে পুনর্বাসন দিয়েছিলেন।

সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করেই ক্ষান্ত থাকেননি তিনি। স্থান মাহাত্ম্যকে জনপ্রিয় করার জন্য পাঁচটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। অষ্টবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে মনোরম প্রাসাদ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র নির্মাণ করেছিলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের মধ্যেই তা প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু মন্দিরগুলি আজও বিদ্যমান। অবশ্য বয়সের ভারে কিছুটা জীর্ণ। এই মন্দিরগুলিকে ঘিরেই শিবনিবাস আজ শিবতীর্থ।

অষ্ট কোণাকৃতি শিবমন্দিরটি নির্মাণ করা হয়েছিল ১৭৫৪ সালে। মন্দিরে অবস্থান করছেন যে শিবলিঙ্গ তাঁর নাম রাজরাজেশ্বর। ভক্তরা আদর করে ডাকেন 'বুড়ো শিব'। প্রবাদ, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র নাকি

কিছুদিন শিবনিবাসে অবস্থান করেছিলেন।

তারপর কঙ্কনা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। শিবনিবাসে শিবসত্য হয়ে আছেন। গড়তে যিনি ভালবাসেন, তিনি একের পর এক অনেক কিছু গড়ে যান। শিবনিবাসের পর ‘গঙ্গাবাস’। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অপর একটি কীর্তি। প্রায় দু’শো চল্লিশ বছর পূর্বে অলকানন্দার তীরে তিনি গড়ে তুলেছিলেন আরও একটি রাজধানী গঙ্গাবাস। দু’শো চল্লিশ বছর এমন কিছু দীর্ঘসময় না হলেও একমাত্র নামছাড়া গঙ্গাবাসের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। যে অলকানন্দার রূপে মুগ্ধ হয়ে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ‘শান্তির নীড়’ গড়ে তুলেছিলেন, কালের অকাল গ্রাসে তা ধ্বংসস্তূপে পরিণত। গঙ্গাবাসের বুকে চাষ আবাদ হচ্ছে। তাহলেও, সেই সময়ের দু’ চার কথা উল্লেখ করা যাক।

দ্বিগম্বুজ বিশিষ্ট ‘হরিহরের’ মন্দির হরনিবাসের একমাত্র জীর্ণ সাক্ষী। কালের সঙ্গে সংগ্রাম করে বিধ্বস্ত। ‘হরিহর’ মন্দিরটিকে কেন্দ্র করে গঙ্গাবাস তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। শুধু হরি আর হরের সংযুক্ত প্রস্তর মূর্তি নয়, আরও ছটি দেব-দেবীর মূর্তি ওই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি।

যেহেতু পূজার্চনায় কোনো বাধ্যকতা ছিল না, সর্বশ্রেণীর ধর্মপ্রাণ মানুষ, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গঙ্গাবাস-এ সমবেত হতেন। বিশেষ করে পৌষ-সংক্রান্তি, বারুণী ও দশেরার সময় তীর্থযাত্রীর ব্যাপক ভিড় হোত। পবিত্র অলকানন্দায় অবগাহন করে হরিহরের পুজো দিতেন হাজার হাজার তীর্থযাত্রী। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাধু-সন্তের পবিত্র সমাগমে গঙ্গাবাসের গৌরব বৃদ্ধি হোত।

শিবনিবাস প্রাসাদের মতো গঙ্গাবাস-এর প্রাসাদটি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। অষ্টবিংশ শতাব্দীর ছয়ের দশকে যে প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকেই তা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। গঙ্গাবাস-এর প্রাসাদ বর্তমানে বিশাল ধ্বংসস্তূপ। শ্বাপদসঙ্কুল ভগ্নাবশেষ। হরিহরের মন্দিরও প্রায় ভগ্ন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পূর্বে হরিহর ও অন্যান্য দেবার্চনার জন্য জনৈক তর্কবাগীশকে একশো দু’বিঘা জমি দান করেছিলেন। তর্কবাগীশের কোনো বংশধর এখন আছেন কিনা আমার জানা নেই। অবশ্য তেমন ভাবে অনুসন্ধান করার সময় সুযোগ পেলে অসমাপ্ত কাজটি সম্পন্ন করার চেষ্টা করব। হরিহরের মন্দিরে এখনও কাসর ঘণ্টা বাজে কিনা তাও বলতে পারব না। পুণ্যক্ষেত্র অলকানন্দারও কোনো অস্তিত্ব নেই। পলি পড়ে বিশাল এলাকা চাষের জমি। নদীয়ার একটি শ্রুতিমধুর নামে নদী অলকানন্দা বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

শহর কৃষ্ণনগর থেকে গঙ্গাবাসের দূরত্ব মাত্র ন’ কিলোমিটার। বৈষ্ণব তীর্থ নবদ্বীপের দূরত্বও ন’ কিলোমিটার। উল্লেখ্য গঙ্গাবাসের একটি শিবমন্দির ছিল। কালভৈরব সেখানে অবস্থান করতেন। শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের পদচিহ্নও সেখানে রক্ষিত আছে। মহারাজ পদচিহ্নটি চিত্রকূট থেকে এনেছিলেন। অলকানন্দার সঙ্গে গঙ্গাবাসের তীর্থক্ষেত্র বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

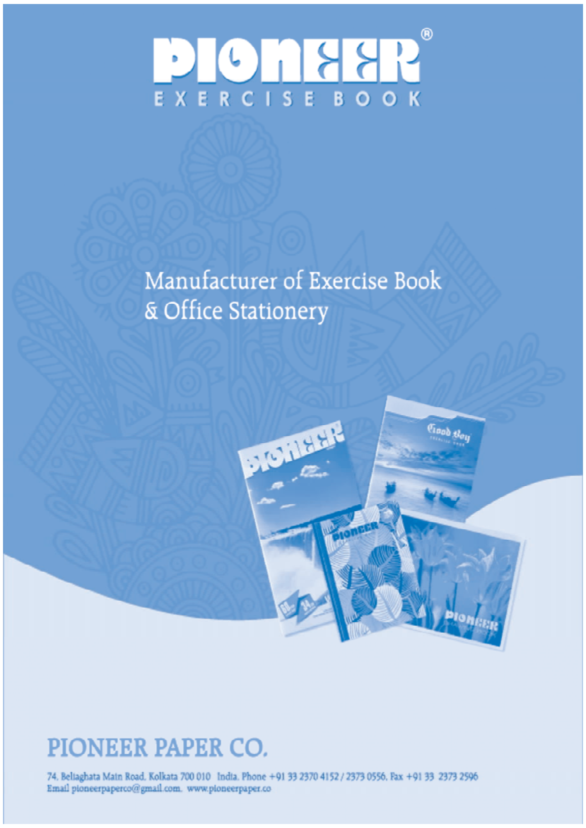

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না
স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম
চির পরিচিত
দুলালের ®
তালমিছরি
আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে
খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা
লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি
এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান
— দারুণ কাজ দেবে।
Regd. Trade Mark
দুলালের
তালমিছরি
ভারত সরকারের
R
® চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন
দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী
দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

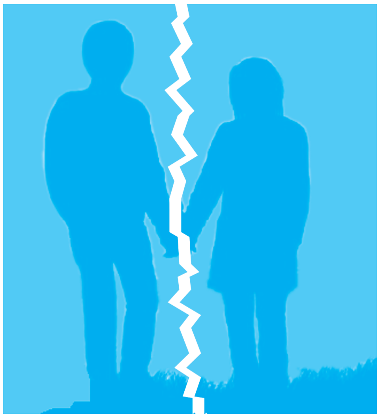

বিবাহ বিচ্ছেদ এড়াতে মেয়েদেরও সহিষ্ণুতা প্রয়োজন

শবরী ঘোষ

এই লেখার শিরোনাম দেখে অনেক মেয়ে ক্ষুব্ধ হতে পারেন। প্রথমেই সবিনয়ে জানাই, আজকের ভোগবাদী দুনিয়ায় বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা ক্রমাগত যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার জন্য কোনো ভাবেই একতরফা মেয়েদের দায়ী করা যায় না। দাম্পত্যজীবন সফল করতে গেলে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের সদিচ্ছা, বন্ধুত্ব, সহমর্মিতা, পারস্পরিক বোঝাপড়া ইত্যাদি গুণগুলির একান্ত প্রয়োজন। ভারতবর্ষের মতো দেশে এর পাশাপাশি দুইজনের পারিবারিক মূল্যবোধও একটা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনেক সময় বিবাহবিচ্ছেদের পেছনে স্বামীর অত্যাচার, একাধিক নারীর সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক বা শ্বশুরবাড়ির নির্যাতন কারণ থাকে। কিন্তু একথা স্বীকার করে নিয়েও বলা যায় যে, বহু ক্ষেত্রে মেয়েদের সহিষ্ণুতার অভাবও কিন্তু বিবাহবিচ্ছেদের জন্য দায়ী থাকে।

পাশ্চাত্যের ‘নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি’-র ধারণায় অন্ধভাবে প্রভাবিত কিছু মেয়ে বিয়ের পর কিছুতেই স্বামীর পরিবারের সঙ্গে একত্রে বসবাস করতে চায় না। আজকাল বহু পরিবারেই একটিমাত্র কন্যাসন্তান রয়েছে। তাদের কারো কারো বক্তব্য হলো যে, বিয়ের পরেও বৃদ্ধ বাবা-মা’কে দেখভাল করার জন্য তাদের বাপের বাড়িতেই থেকে যেতে হবে। কিন্তু সত্যিই কি তাই হয়? কোনো মেয়ের যদি বৃদ্ধ বাবা-মায়ের সেবা করার প্রকৃত সদিচ্ছা থেকে থাকে তাহলে সে শ্বশুরবাড়ির প্রতি যাবতীয় দায়দায়িত্ব পালন করেও সেই কাজ করতে পারে। প্রয়োজনে মেয়েটি বাবা-মা’কে নিজের শ্বশুরবাড়িতেও থাকতে বলতে পারে। আবার মেয়েটির বাবা-মায়ের যদি তার শ্বশুরবাড়িতে থাকতে আপত্তি থাকে তবে সে প্রয়োজনে প্রতিদিন বাপের বাড়িতে যাতায়াত করেও তাঁদের দেখভাল করতে পারে। শ্বশুর এবং শাশুড়িকে যদি মেয়েরা নিজেদের জন্মদাতা বাবা-মায়ের মতো শ্রদ্ধা ও সমাদর করতে পারে তবে বিবাহিত জীবন তাঁদের সস্নেহ আশীর্বাদ ও সাহচর্যে সফল হতে পারে। অনেক মেয়ে আবার বিয়ের পর নিজেদের স্বাধীন ‘স্পেস’ দাবি করে। শ্বশুরবাড়িতে থাকলে নাকি তাদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হবে! প্রশ্ন হলো, এই সব মেয়েরা স্বাধীনতা এবং স্বেচ্ছাচারিতা শব্দ দুটিকে কি সমার্থক বলে মনে করে? উচ্চবিত্ত পরিবারগুলির পাশাপাশি আজকাল মধ্যবিত্ত পরিবারের কিছু মেয়ের মধ্যেও এই বাতিক দেখা দিয়েছে। এটা ডিভোর্সের অন্যতম কারণ। শ্বশুর-শাশুড়ি বিয়ের পর রুচিশীল পোশাক পরতে বলছেন, বিনা প্রয়োজনে মধ্যরাত পর্যন্ত বাড়ির বাইরে থাকলে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা আপত্তি করেন, পুত্রবধূ ধূমপান বা মদ্যপান করলে শাশুড়ি পছন্দ করেন না— এইসব ঘটনা ডিভোর্স পর্যন্ত গড়াচ্ছে। এক্ষেত্রে মেয়েদের প্রধান অভিযোগ হলো তাদের স্বামীরা নাকি নিজের বাবা-মা’র প্রতি এতটাই অনুরক্ত যে তাদের কথার কোনো মূল্যই থাকে না। ধূমপান বা মদ্যপানের কুফল অথবা মধ্যরাতে ফাঁকা শহরে নিরাপত্তাহীনতার বিষয়টি এসব মেয়েরা ভেবে দেখলে পারেন। আর রুচিশীল পোশাকেও কিন্তু নিজেকে শোভন ও প্রগতিশীল বলে হাজির করা যায়। তাছাড়া মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। ‘স্পেস’ দাবি করে শ্বশুরবাড়ি থেকে আলাদা হলেও সমাজ থেকে আলাদা হতে পারবেন কি?

উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনেক সময় ডিভোর্সের কারণ ঘটায়। শুনতে কুরুচিকর হলেও একথা সত্য যে কিছু কিছু বিবাহিতা মহিলা শুধুমাত্র অফিসে পদোন্নতির জন্য ঊর্ধ্বতন পুরুষ কর্মচারীদের সঙ্গে অশোভন সম্পর্কে লিপ্ত হতে দ্বিধা করে না। কেউ কেউ আবার কর্মক্ষেত্রেই নিজেদের যাবতীয় সময়, উৎসাহ, উদ্দীপনাকে ব্যয় করে। স্বামী বা সন্তানের জন্য প্রয়োজনীয় কর্তব্যটুকু পালনে ততটা আগ্রহ নেই। আবার অনেকে এতটাই বেশি কেরিয়ার সর্বস্ব যে, বিবাহিত জীবনে তারা সন্তান কামনা করে না। কিন্তু কেরিয়ারমুখী হতে গিয়ে তারা যেন যন্ত্রমানবী না হয়ে যায়। সংসারে অর্থের যেমন প্রয়োজন, তেমন কিন্তু ‘ইমোশন’ বা আবেগেরও মূল্য আছে। খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছে গিয়ে যেন নিজেকে বড় একাকী না মনে হয়। হাজার ডিপ্রেশনের ওষুধও কিন্তু সেই মানসিক নিঃসঙ্গতাকে দূর করতে পারবে না।

সম্পর্ক ভেঙে দেওয়া কাঁচের গ্লাস ভাঙার থেকেও অনেক সহজ কাজ। যে সম্পর্ক শুধু বেদনা দেয়, সেই সম্পর্ককে জোর করে টিকিয়ে রাখা অর্থহীন এ কথা সত্য। কিন্তু খারাপ মানুষের চরিত্রও অনেক সময় ভালো মানুষের সংস্পর্শে এসে পাল্টে যায়। কাজেই অন্তত একবারের জন্য হলেও মেয়েদের সেই চেষ্টা করা উচিত। আমাদের দেশে মেয়েরা মাতৃরূপে পূজিতা হন। মা তাঁর স্নেহ, মমতা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতার দ্বারা আমাদের মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটান। বিয়ের পর মেয়েরা যদি একটু বেশি সহিষ্ণুতা দেখান, তবে অনেক ক্ষেত্রেই ভাঙনের মুখে এসেও সম্পর্ক টিকতে পারে। স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির লোকদের অপমান মুখ বুজে হজম করা নয়। কিন্তু কথায় কথায় ৪৯৮-এর ভয় দেখানো বা ডিভোর্স করাটাও নারী স্বাধীনতার সমার্থক নয়। ■

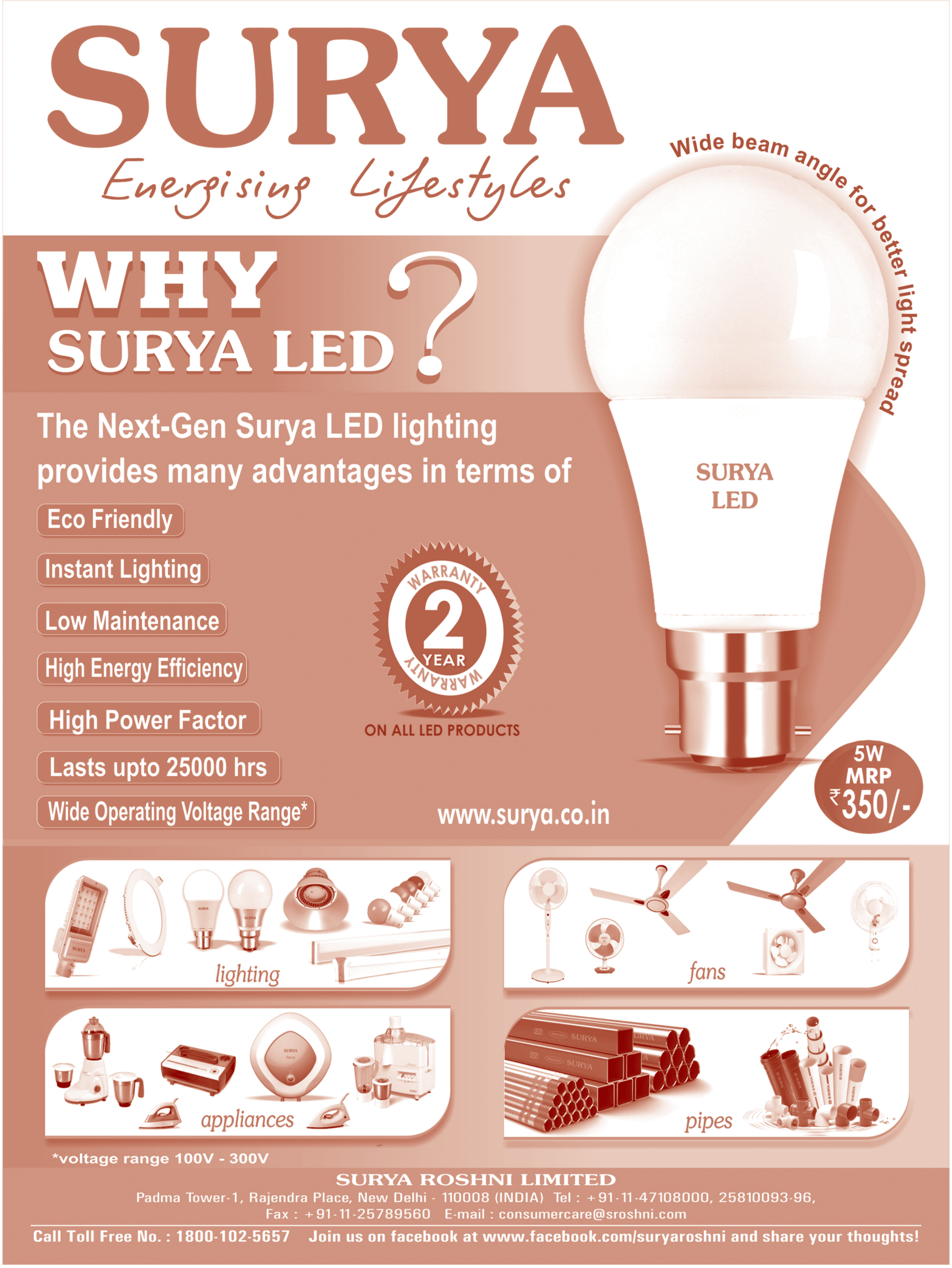
SURYA
Energising Lifestyles
WHY SURYA LED ?
Wide beam angle for better light spread
The Next-Gen Surya LED lighting provides many advantages in terms of
Eco Friendly
Instant Lighting
Low Maintenance
High Energy Efficiency
High Power Factor
Lasts upto 25000 hrs
Wide Operating Voltage Range*
WARRANTY 2 YEAR WARRANTY
ON ALL LED PRODUCTS
SURYA LED
5W MRP ₹350/-
www.surya.co.in
lighting
fans
appliances
pipes
*voltage range 100V - 300V
SURYA ROSHNI LIMITED
Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi - 110008 (INDIA) Tel : +91-11-47108000, 25810093-96,
Fax : +91-11-25789560 E-mail : consumercare@sroshni.com
Call Toll Free No. : 1800-102-5657 Join us on facebook at www.facebook.com/suryaroshni and share your thoughts!

আইনস্টাইনের ছেলেবেলা

বিরাজ নারায়ণ রায়

বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন জন্মেছিলেন জার্মানির উম (Ulm) শহরে, ১৮৭৯ সালে। ছোটবেলা থেকেই তিনি একটু অন্য প্রকৃতির ছিলেন। কেমন যেন পিছিয়ে পড়া, লাজুক। তাঁর বাবা হার্মান আইস্টাইন একবার স্কুলের শিক্ষকদের জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, আলবার্ট কোন্ পেশার জন্য উপযুক্ত হতে পারে। এই শুনে স্কুলের প্রধান শিক্ষক জবাব দিয়েছিলেন— কোনো পেশার জন্যই সে উপযুক্ত নয়। কারণ সে কখোনই কোনো কাজে সফল হতে পারবে না।

একই কথা বলেছিলেন তাঁর জার্মান ভাষার শিক্ষকও। কিন্তু এই ভবিষ্যদ্‌বাণী ব্যর্থ হয়েছিল। ক্লাসের পিছিয়ে পড়া, অমনোযোগী ছাত্র আইনস্টাইন পদার্থ বিজ্ঞানে অভুতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেন।

তিন বছর বয়স পর্যন্ত কথাই বলতে পারতো না আইনস্টাইন। তারপর কথা বলা শিখল বটে, কিন্তু আধো আধো, একটি কথাকে বারবার উচ্চারণ করে। তার কথার গতি ধীর ছিল কিন্তু অঙ্ক আর পদার্থবিদ্যায় তার বুদ্ধি ছিল তিরের মতো তীক্ষ্ণ। ক্লাসে অন্যান্য বিষয়ে ফল ভাল হত না, কিন্তু অঙ্কে ছিল তাক লাগানো সাফল্য।

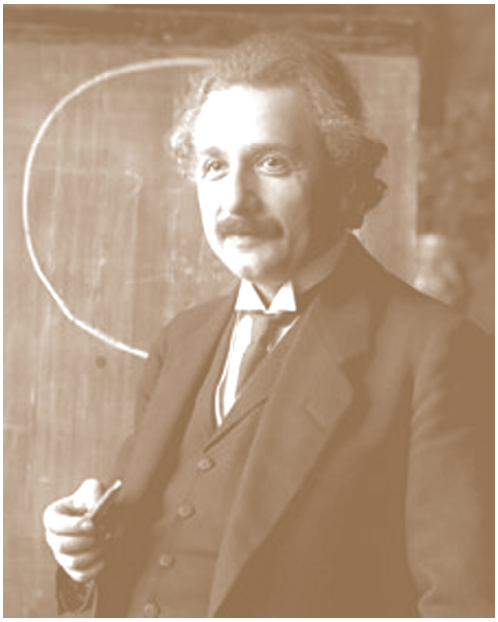

এছাড়া আরো একটি বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন আইনস্টাইন। বেহালাবাদন। মাত্র ছয় বছর বয়সে তা রপ্ত করেছিলেন। নিত্যসঙ্গী ছিল বেহালা। এই বয়সে সবাই সঙ্গীতের সুর শিখতে শুরু করে। আর আলবার্ট সেই সময়ই বড় বড় সঙ্গীতজ্ঞদের সুর বাজাতে শুরু করেছে। প্লট নামে আইনস্টাইনের এক বন্ধু ছিলেন। তিনি একবার বলেছিলেন— 'আলবার্ট যখনই কোনো গভীর বিষয় নিয়ে ভাবতেন তখনই সে গভীর রাতে রান্নাঘরে গিয়ে একমনে বেহালা বাজাতো।' গণিত ও সঙ্গীত, এই দুটোকে তিনি জীবনে সবচেয়ে বেশি আপন করে নিয়েছিলেন। স্কুলের অনুশাসন তাঁর ভাল লাগত না। ভালোবাসতেন নিজে নিজে পড়াশুনা করতে। সেই সময় জার্মানিতে ছিল সামারিক শাসন। ছোটবেলায় তিনি অবাক হয়ে ভাবতেন—এ কেমন ব্যবস্থা?

ছোটোবেলার একটি ঘটনা পদার্থ বিজ্ঞানের প্রতি আইনস্টাইনের আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়। পাঁচ বছর বয়সে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্কুলে যেতে পারতেন না। কাজেই বাড়িতেই থাকতে হোত সারাক্ষণ। তখন বাবা ওর মন ভুলিয়ে রাখার জন্য একটি কম্পাস কিনে দেন। এই দেখে মুগ্ধ হয়ে পড়ে সে। সারাক্ষণ তাকিয়ে থাকে কম্পাসের দিকে। মনে মনে ভাবত— এই চুম্বক কি কোনো একটি নির্দিষ্ট দিকেরই নির্দেশ করে থাকে? কী এর রহস্য? এখান থেকেই শুরু হয় তাঁর রহস্য উদঘাটনের আকর্ষণ।

ছোটবেলা থেকে নিজের ইচ্ছেকেই গুরুত্ব দিতেন আইনস্টাইন। ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করা তাঁর স্বভাব ছিল না। কিন্তু যা করতেন সেটা খুব ভালো করে করতেন। নইলে কী আর এত বড় বিজ্ঞানী হতে পারেন!

রাজ্য পরিচিতি

মহারাষ্ট্র

ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের জন্মভূমি মহারাষ্ট্র। ভারতের পশ্চিম প্রান্তে সিন্ধুসাগর উপকূলে অবস্থিত। উত্তরে গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশ। দক্ষিণে কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশ। পূর্বে ছত্তিশগড়। আয়তন ৩০ লক্ষ ৭ হাজার ৭১৩ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা ১১ কোটি ৭৮ লক্ষ ৫৩ হাজার ৬৩৬ জন। ভাষা মারাঠী। সারা রাজ্য ঐতিহাসিক দুর্গ ও গৌরবময় ইতিহাসে ভরপুর। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের ত্র্যম্বকেশ্বর, ঘৃষ্ণেশ্বর ও ভীমাশঙ্কর এই রাজ্যেই। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার এবং দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজীর সাধনভূমি রেশিমবাগ, ড. আম্বেদকর ধর্মচক্র প্রবর্তনের দীক্ষাভূমি, গান্ধীজীর সেবাগ্রাম, বিনোবাভাবের পওনার এ রাজ্যের নবীন তীর্থ। গণেশ উৎসব এখানকার প্রাচীন উৎসব। মুম্বই রাজ্যের রাজধানী। এখানকার অজন্তা ও ইলোরা পৃথিবীখ্যাত।

প্রশ্নবাণ

১.অশোকচক্রে কটি অর (spoke) আছে?

২.বন্দেমাতরম্—কোন্ উপন্যাসের অন্তর্গত?

৩.ভারতের জাতীয় ধ্যেয়বাক্য কী?

৪.ভারতের জাতীয় পক্ষী কী?

৫.ভারতের সংবিধান কোন্ সালে গৃহীত হয়?

উত্তর : ১. ২৪টি। ২. আনন্দমঠ। ৩. সত্যমেব জয়তে। ৪. ময়ূর। ৫. ১৯৪৯ সালে ২৬ নভেম্বর।

ছবিতে অমিল খোঁজ

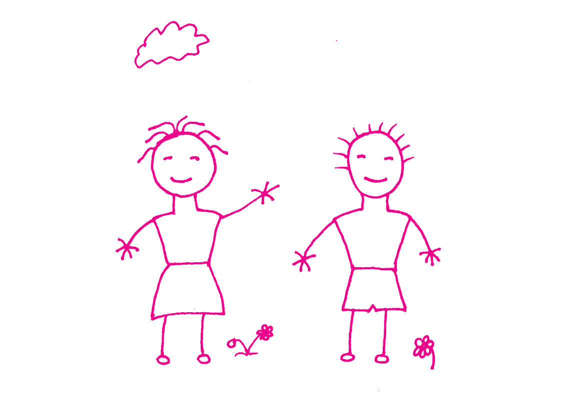

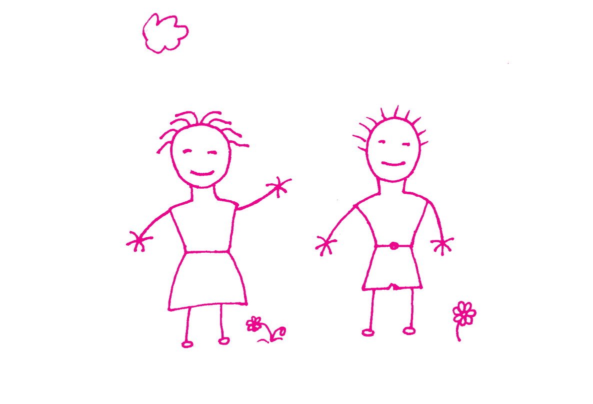

ছোটদের কলমে

রমেশ দাদা

রূপষা দেবনাথ, বিরাটি, ষষ্ঠ শ্রেণী

রমেশ দাদার পেটটি বড়ই ঢোলা
ছোলা খায় গাদা গাদা,
রুটি খায় মোটা মোটা
লোকে তাই নাম দিয়েছে ভোলা।

খেতে বসে মাটিতে
খায় দুধ-রুটি বড় বাটিতে,
রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে
মনে হয় হাতি চলে।

যখন মা দেয় বকুনি
কাঁদে না সে একটুখানি,
গান গায় গুনগুনিয়ে
লোকে তাকে খ্যাপায় এ নিয়ে।

মানুষটি ভালো বটে
সবাইকে ভালোবাসে,
কেউ তাকে মোটা বললে
মনে মনে ভীষণ চটে।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : ৮৪২০২৪০৫৮৪
E-mail : swastika5915@gmail.com

মেল করা যেতে পারে।

তৃণমূল কংগ্রেসীদের হাতে সেনাদেরও নিস্তার নেই

দেবব্রত ঘোষ

খোদ কলকাতা শহরে প্রকাশ্য দিবালোকে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা মহম্মদ সোহরাবের ছেলে আম্বিয়া সোহরাব মদ্যপ অবস্থায় বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে ভারতীয় বিমানবাহিনীর তরুণ জওয়ান অভিমুন্য গৌড়কে পিষে মেরে ফেললো— এটা একটা নিছক দুর্ঘটনা নয়। বলা যায় বৃহত্তর এক ষড়যন্ত্রের আংশিক প্রকাশ। এই নারকীয় ঘটনার দায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এড়াতে পারেন না। পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ এখন তৃণমূল কংগ্রেসের দলদাসে পরিণত এবং তৃণমূল কংগ্রেসের গুণ্ডা বাহিনীর সঙ্গে মিলে বিরোধী পক্ষকে ডান্ডা মেরে ঠাণ্ডা করার কাজে নিরত। রাজ্যের পুলিশ প্রধান, কলকাতার পুলিশ কমিশনার, গোয়েন্দা প্রধান থেকে শুরু করে পুলিশের বড় মাঝারি ছোট সব কর্তারাই মমতা-ভজনে রত। এদের কাছ থেকে বেপরোয়া গাড়িচালক, মস্তান, তোলাবাজ, মাফিয়া, মাতাল, ডাকাত কারুরই ভয় পাবার কোনো কারণ নেই যদি তারা তৃণমূল কংগ্রেসের আশ্রিত হয় এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক হলে সাত খুন কেন সহস্র খুন মাপ।

এই আম্বিয়া সোহরাব এক অতি বিত্তবান মুসলমান পরিবারের সন্তান, মদ্যপ, যে আগেও অনেকবার ট্রাফিক রুল অমান্য করেছে, জনবহুল রাস্তায় প্রচণ্ড গতিতে গাড়ি চালিয়ে এবং লাইসেন্স বিহীন গাড়ি চালিয়ে বহু দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস তাকে বাঁচিয়েছে সংখ্যালঘুর প্রতি অতি দরদে। পার্কস্ট্রিট গণধর্ষণ কাণ্ডের নায়ক কাদের খান ও রেডরোড কাণ্ডের নায়ক আম্বিয়া সোহরাব ঘনিষ্ঠবন্ধু। ওই ধর্ষক কাদের খানকে কলকাতা থেকে পালাতে সাহায্য করেছিল আম্বিয়া সোহরাব। সোহরাব পরিবার বিভিন্ন

তৃণমূলী লুম্পেনের গাড়ির ধাক্কায় নিহত ভারতীয় বিমান বাহিনীর জওয়ান অভিমন্যু গৌড়।

ব্যবসায় নিয়োজিত বিশেষ করে মেছুয়া ফলপট্টিতে তাদের রমরমা ব্যবসা যেখান থেকে সমাজের উঁচু তলার পুলিশ অফিসার, রাজনৈতিক নেতা ও প্রশাসনের হর্তাকর্তা বিধাতাদের বাড়িতে দামি ভেট যায় সোহরাব পরিবারের তরফে।

পার্কস্ট্রিট এলাকায় আম্বিয়া সোহরাবের দীর্ঘদিনের যাতায়াত ব্যবসা, মদ্যপান, ধান্দাবাজি ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে। পুলিশের ওপর মহলে সোহরাব পরিবারের যোগাযোগ থাকায় ও তৃণমূলের নেতা হবার সুবাদে এই আম্বিয়া সোহরাব ও তার ভাই বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ্যে অসামাজিক ও অনৈতিক অপকর্ম করেও পার পেয়ে গেছে। সুজেট কাণ্ডের কাণ্ডারি কাদের খান আজও পলাতক, পুলিশের নাগালের বাইরে—সৌজন্যে আম্বিয়া সোহরাব।

যে রাজ্যে পুলিশ পেটানোর অভিযোগে অভিযুক্ত এবং দাগি অভিযোগে অভিযুক্ত এবং দাগি আসামি, মস্তান ও গুণ্ডা প্রতাপ সাহা তৃণমূল নেতা হবার সুবাদে পুলিশ কমিশনারের পাশে তো বটেই খোদ মুখ্যমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তোলেন, একত্রে হাঁটেন এবং নির্লজ্জ এই পুলিশকর্তারা দেঁতো হাসি হাসতে হাসতে হাত কচলান বিগলিত হয়ে সেই রাজ্যের প্রশাসন কি সোহরাব-পরিবারকে ধরবে? কখনো নয়। সোহরাব যে সংখ্যালঘু। একটা লোক কীভাবে সাহস পায় একাধিক সেনা ব্যারিকেড ভেঙে গাড়ি চালাতে? কীভাবে সাহস পায় নাম্বারপ্লেট বিহীন গাড়ি চালাতে? মাতাল অবস্থায় কোন সাহসে গাড়ি চালায়? কতোটা ঠাণ্ডা মাথায় এই তৃণমূলী মাতাল মদের গন্ধ ঢাকবার জন্য গাড়ির ভেতরে সুগন্ধী স্প্রে করে গা ঢাকা দেবার জন্য।

এটা অবশ্যই একটা বড় অন্তর্ঘাত যা এই মুসলমান মাতলটির ঠাণ্ডা মাথার পরিকল্পনা প্রসূত। নিরীহ এক বায়ুসেনাকে পিষে মেরে ফেলার পরে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ অপরাধীকে ধরতে পারে না। এই সোহরাব পরিবারের বাড়ির সব লোক বেপাত্তা হয়ে গেল নিমেষে। কে তাদের খবর দিল যে সোহরাব-পরিবারে পুলিশ অনুসন্ধান করতে আসবে?

উত্তর অতি সহজ। সর্ষের মধ্যেই ভূত। একে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা, তার ওপর সংখ্যালঘু মুসলমান এবং অতি বিত্তবান। এতোটাই বিত্তবান যে অসংখ্য দামি গাড়ির মালিক আম্বিয়া সোহরাব। পুলিশকে টাকা দিয়ে ভয় দেখিয়ে বদলি করে দেবার হুমকি দিয়ে, তৃণমূল কংগ্রেস ফান্ডে প্রচুর টাকা ঢেলে এরা হাসতে হাসতে মানুষ খুন করে। পাকিস্তানি গজল গায়ক গুলাম আলিকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সপারিষদ প্রমোদ অনুষ্ঠানে ব্যস্ত, অপর সমান্তরাল প্রক্রিয়ায় এক মদ্যপ দুষ্কৃতী খেলাচ্ছলে মানুষকে পিষে মারে।

এই সাহস মুসলমান উগ্রবাদীরা অর্জন করেছে তৃণমূল জমানায়।

পাঠানকোট কাণ্ডের পর নিহত ভারতীয় সেনা-পরিবারের প্রতি পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী বা তাঁর দল একটা সান্ত্বনাবাচক শব্দও ব্যয় করেনি। কারণ সহজেই অনুমেয়। নিহত এই ভারতীয় সেনারা হিন্দু বা শিখ, আর জঙ্গিরা মুসলমান। জঙ্গিরা এসেছে পাকিস্তান থেকে, আবার গজল গায়ক গুলাম আলিও সেই পাকিস্তানের লোক। যে আপ্যায়ন গুলাম আলি পেয়েছেন মমতার সরকার থেকে সেই আপ্যায়ন লতা মঙ্গেশকর বা অজয় চক্রবর্তী পাননি কেন! রশিদ খান আপ্যায়ন পান, শাহরুখ খান আপ্যায়ন পান তৃণমূল কংগ্রেস দল ও সরকার থেকে কিন্তু এরা কেউই নিহত ভারতীয় সেনাদের জন্য একবিন্দু চোখের জল ফেলেনি। না রশিদ খান, না শাহরুখ খান, না আমির খান— কেউই পাকিস্তানি আগ্রাসন বা পাকজঙ্গি নিয়ে আজও কোনো নিন্দা করেননি। অথচ এই সব মুসলমান শিল্পী বা অভিনেতারাই তৃণমূলের বড় আপনজন।

রাজ্যে বিধানসভা ভোট আসন্ন। ত্বহা সিদ্দিকী ও সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী তৃণমূল কংগ্রেস তথা মমতাকে সমর্থন দেবার কথা ঘোষণা করেছেন। রাজ্যের মুসলমান ভোটার সংখ্যা ক্রমবর্ধমান এবং এরা তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্ক। অতএব সোহরাব-পরিবার জিন্দাবাদ! গুলাম আলি জিন্দাবাদ! রশিদ খান জিন্দাবাদ! উর্দু আকাদেমি জিন্দাবাদ। গদি চাই আবার, আবার ক্ষমতা চাই, আরো আরো টাকা চাই দলীয় তহবিলে আর নেতাদের ব্যক্তিগত বেনামি অ্যাকাউন্টে। খাগড়াগড়-মুর্শিদাবাদ-বীরভূম-কালিয়াচক এবং আরো অনেক ইসলামি মৌলবাদী অধ্যুষিত এলাকায় তৃণমূলের রমরমা এবং অবাধ প্রসার। এই অনুপ্রবেশ, জঙ্গিযোগ পাঠানকোটের পাকিস্তানি হামলা এবং কলকাতার রেড রোডে সেনা পিযে মারা একই সমান্তরাল ধারায় হয়েছে।

তৃণমূলের নিজস্ব টেলিভিশন চ্যানেল, তৃণমূলের পদলেহনকারী একাধিক চ্যানেল, নিজস্ব পত্রিকা, অন্ধ তৃণমূল সমর্থক একাধিক পত্রিকা, উর্দু পত্রিকা প্রচার করছে মমতার হয়ে। খেলা-মেলা-যাত্রা, মাটি উৎসব, মাছ উৎসব, সাইকেল প্রদান, ক্লাবগুলোকে অনুদান প্রদান চলছে, আকাশে উড়ছে হাজার হাজার কোটি টাকা। সারদা, রোজভ্যালি, এমপিএস এবং আরো কতো চিট ফান্ড থেকে প্রাপ্ত অর্থ আজ তৃণমূলকে মহাবলী করেছে, আরো উদ্ধত ও নৃশংস করেছে। মমতা বলেছেন— আমি যা করে দিলাম সাড়ে চার বছরে আগামী চারশো বছরে কেউ তা পারবে না। সত্যিই তো! টেট কেলেঙ্কারি, এসএসসি কেলেঙ্কারি, কলেজ সার্ভিস ও পাবলিক সার্ভিস কমিশনে অধ্যাপক নিয়োগে অস্বচ্ছতা ও স্বজনপোষণ, মোটা টাকা ঘুষের বিনিময়ে চাকরি, প্রোমোটারি, জবর দখল, সিন্ডিকেটরাজ, ধর্ষণ, ডাকাতি, জালিয়াতি, অনুপ্রবেশ, দেশদ্রোহিতায় মদতদান, শিল্পগড়ার মিথ্যে স্তোকবাক্য, জনগণের টাকায় দানছত্র— এগুলো তৃণমূলের অবদান যা পশ্চিমবাংলাকে কয়েক শতক পিছিয়ে দিল।

তাই বলা যায়— রেড রোডে বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে বায়ুসেনা হত্যা, খাগড়াগড় বিস্ফোরণ, বাংলাদেশি জঙ্গিদের অবাধ অনুপ্রবেশের মাধ্যমে জালনোটের ছড়িয়ে পড়া, হিন্দু মেয়ে ধর্ষণ সবই এক সূত্রে বাধা যাঁর নাম নব্য তৃণমূলী ইসলামি অভ্যুত্থান।

উবাচ

“কে কৃষকদের নেতা? রাহুল তো শুধু কৃষকদের কথা বলেছেন। অথচ বেশিরভাগ কৃষক সাংসদ বিজেপিতেই রয়েছেন।”

রাধামোহন সিং।
কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী।

“আমার মনে হয় না রাহুলের ওই বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতা আছে। কোনো আলটপকা মন্তব্যকে আমল না দেওয়াই ভালো।”

পাঠানকোটে জঙ্গি হামলা নিয়ন্ত্রণে রাহুলের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে।

স্মৃতি ইরানী
কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী।

“আমেরিকার দৃঢ় কূটনীতির মাধ্যমে কী সম্ভব আমরা তা দেখতে পাচ্ছি।”

পরমাণু অস্ত্র-সংক্রান্ত শর্ত মেনে নেওয়ায় ইরাণের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর।

বারাক ওবামা,
প্রেসিডেন্ট, ইউ এস এ

“মাদ্রাসা পড়ুয়াদের দেশভক্তি শেখানো উচিত।”

ইন্দ্রেশ কুমার
আর এস এসের প্রবীণ কার্যকর্তা।

“তৃণমূলকে হঠাতে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট জরুরি।”

পার্টির কংগ্রেস-বিরোধিতার সর্বসম্মত লাইন থেকে সরে গিয়ে।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ।

।। চিত্রকথা ।। বিক্রমাদিত্য ।। ১৪

পাকিস্তানি লেখিকা ফারহানজ ইস্পাহানি-র চোখে পাঠানকোটে হামলার পেছনেও রয়েছে পাকিস্তানি মোল্লা- সেনা-জোট

সম্প্রতি পাঠানকোটের সেনা ছাউনিতে আপাতভাবে যে জেহাদি আক্রমণ সংঘটিত হয়েছে তার মূলে যে শুধুমাত্র পাকিস্তানি জৈস-এ-মহম্মদ বা অন্যান্য সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর মদত রয়েছে শুধু নয়, এই চক্রান্তে ও পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিকল্পনায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীও যে সরাসরি জড়িত তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রমাণ ইতিমধ্যেই দেশের তদন্তকারী আধিকারিকদের হাতে আসছে। সংসদ আক্রমণ থেকে শুরু করে এই চক্রান্ত কাহিনি এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় ঘটে চলেছে। সাম্প্রতিক আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় নানা মুনির নানা মত। বিরোধী কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী বলে দিয়েছেন সরকারের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় গাফিলতি ছিল। ঘটনার পর দূর থেকে মন্তব্য ছুঁড়ে দেওয়ার মধ্যে যে বাহাদুরি নেই তা সকলেই জানেন। আমেরিকা-সহ বিশ্বের অনেক দেশই পাকিস্তান সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ। মূল ভারত থেকে ইংরেজ আমল বা তার পরে সৃষ্টি হওয়া বার্মা, শ্রীলঙ্কা, ভুটান, নেপাল, বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানকে এক পংক্তিতে বসাতে অনেক কূটনীতিকই গররাজি। পাকিস্তানের এই জন্মগত ভারত-বিরোধিতার মূলানুসন্ধানেরও চেষ্টা করেছেন দীর্ঘদিন পাকিস্তানবাসী সুপণ্ডিত লেখিকা ও পূর্বতন পাকিস্তানি কূটনীতিক হুসেন হাক্কানির স্ত্রী শ্রীমতী ফারহানজ ইস্পাহানি। একজন পাকিস্তানি হিসেবে তাঁর দেশের দৃষ্টিভঙ্গি, অতীত আচরণ ও অভিসন্ধির এক খোলামেলা উন্মোচন ঘটিয়েছেন তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত 'Purifying the land of the Pure' গ্রন্থে। এই মর্মে একটি ইংরেজি দৈনিককে দেওয়া তাঁর অকপট সাক্ষাৎকারটি পাঠকের কাছে তুলে ধরা হলো। বলে রাখা দরকার, সাক্ষাৎকারের বক্তব্য একান্তই লেখিকার নিজস্ব। শুধুমাত্র পাকিস্তানকে তিনি কীভাবে বিশ্লেষণ করছেন সেটা জানাতেই এটি প্রকাশ করা হলো।

■ **আপনি বলছেন পাকিস্তান জন্মলগ্নে একটি উদারবাদী দেশ হিসেবেই শুরু করেছিল।**

■ শুনুন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জিন্না ভারতের এক বহুমাত্রিক নানা ভাষাভাষীর রাজ্য মুম্বই-য়ের লোক ছিলেন। ধর্মগতভাবে শিয়া সম্প্রদায়ের হলেও তিনি একজন ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ ছিলেন। হয়ত আপনারা জানেন না— দেশবিভাগের ১ বছরের মধ্যেই মি. জিন্না দেশের সংখ্যালঘুরাও যে দেশের সংখ্যাগুরু নাগরিকদের মতোই সমান সুযোগ সুবিধে পাওয়ার অধিকারী এই মর্মে অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় একটি বক্তৃতা দেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় তখনকার রেডিয়োর তরফে গৃহীত সেই ভাষণটি কখনই পাকিস্তানে সম্প্রচারিত হয়নি। অত্যন্ত ক্ষমতাশালী আমলা ও প্রভাবশালী শিল্পমহল তা চেপে দেয়। আজ অবধি সেই টেপটি আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিন্তু সেই বক্তৃতার লিখিত সারাংশটি উদ্ধার হয়েছে।

একেবারে প্রথম দিন থেকেই এটা বোঝা গিয়েছিল পাকিস্তানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠদের সঙ্গে সমান অধিকারপ্রাপ্ত নাগরিক হিসেবে বাঁচা বেশ দুষ্কর। এর প্রথম ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল দেশভাগ হওয়ার পরে পরেই যখন পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী অভীষ্টের দিকে লক্ষ্য রেখে একটি মুসলমান দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করেছিল। পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে শুরুটাই ধর্মনিরপেক্ষতামুখী ছিল না। ইতিমধ্যেই অমুসলমানদের অন্য নজরে দেখা শুরু হয়ে গিয়েছিল। তার প্রতিফলন ব্যবহারেও প্রতিফলিত হতে শুরু করে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানে ২৩ শতাংশের অমুসলমান ধর্মাবলম্বীরা ছিলেন যা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। আজ সেই সংখ্যা মাত্র তিন চার শতাংশে নেমে এসেছে। আবার এই তিন চার শতাংশের মধ্যে ঢুকে আছে আহমদি সম্প্রদায়ের মুসলমানরা। এদের পাকিস্তানে মুসলমান বলে গণ্যই করা হয় না। কেননা যদি কোনো পাকস্তানি নাগরিক পাসপোর্টের আবেদন করে সেক্ষেত্রে তাকে লিখিত ঘোষণা করতে হবে যে তিনি আহমদিদের মুসলমান মনে করেন না। ধর্মীয় বিদ্বেষ আজকাল অনেক দেশেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হওয়ার দৌড়ে থাকা ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন যে সব মুসলমানদের ক্যাম্পে আটকানো দরকার। কিন্তু পাকিস্তানে ব্যাপারটা একেবারেই আলাদা। এখানে আইন করে দেশে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ করার রক্ষা কবচ রয়েছে।

■ **আচ্ছা পাকিস্তানি রাজনীতিবিদরা**

নির্যাতন করার রাজনৈতিক পন্থা কেন ধরলেন?

 বলছি, প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত যেমন ভারত থেকে এসেছিলেন তেমন আরও অনেকেই আদতে ছিলেন ভারতের। এঁদের পাকিস্তানে সেই অর্থে নিজেদের বলতে কোনো ভিত্তি বা নির্দিষ্ট সমর্থক গোষ্ঠী ছিল না। যেমন কোনো আদি নিবাস বা নিশ্চিত ভোটদাতার দল সেসব কিছুই নয়। তাই এঁরা সমর্থন জোটাতে হাত মেলালেন মোল্লাদের সঙ্গে যাতে তাঁদের সমর্থন কব্জা করা যায়। তাই ১৯৪৭ থেকে ১৯৫১ এই সময়টাকে আমি বলছি— Muslimisation-এর প্রথম পর্ব। দেশভাগের ফলে পাকিস্তানের হিন্দু ও শিখ জনসংখ্যার বিশাল অংশ দেশ ছাড়ার কারণে সংখ্যাগতভাবে মুসলমানরা আধিপত্যবাদী হবার চেষ্টা করে। এর পরেই এল ১৯৫৮-৭১ সাল। দেশের পাঠ্যপুস্তকগুলি থেকে বহুত্ববাদকে একেবারে ছেঁটে ফেলা হলো। পাকিস্তানিদের একমাত্র পরিচয় হলো ধর্মকেন্দ্রিক ইসলামপন্থী। মহেঞ্জোদড়ো, তক্ষশীলা বা সুফিবাদ সম্পূর্ণ প্রান্তিক হয়ে পড়ল।

এরপর ১৯৭৪ থেকে তৃতীয় পর্যায়ের ইসলামিকরণ শুরু হলো। সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে একেবারে আইন করে বৈষম্যবাদকে মান্যতা দেওয়া হলো। প্রথম আইনটি আহমদিয়াদের অমুসলমান আখ্যা দিয়ে পাশ হলো জুলফিকার আলি ভুট্টোর হাতে। তাঁকে সামরিক বাহিনী ও মোল্লাদের তরফ থেকে প্রবল চাপ দেওয়া হয়। তিনি মনে করেছিলেন এটি হয়তো সাময়িক কোনো ব্যবস্থা। কিন্তু বরাবরের জন্যই রয়ে গেল। এরপর এল চরম ধাপ। চতুর্থ পর্বের মুসলিমিকরণ। ভুট্টোর পর ১৯৮৮ পর্যন্ত বাকিটা করলেন জিয়া। এটি হলো আতঙ্কবাদ সৃষ্টি করা ও ১৯৯০ থেকে একেবারে হিংসা, খুন জখমের শাসন কায়েম করা।

 প্রাথমিকভাবে এটা কাদের হাতে শুরু হলো?

 জেহাদি বাহিনী এই কাজ হাতে তুলে নিল। এদের সৃষ্টি করেছিল সামরিক বাহিনী ও মোল্লাদের জুটি। এরাই আজকের পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রক। সবকিছু তারাই ঠিক করে। মোদী ও শরিফের সম্পর্ক অত্যন্ত সঠিক পথেই অগ্রসর হচ্ছিল। কিন্তু ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় এদের কোনো আগ্রহ নেই। তাই আমি ও আমার স্বামী বেশ টের পাচ্ছিলাম পাঠানকোটের মতো কিছু একটা ঘটতে চলেছে।

মনে রাখবেন জৈস-এ-মহম্মদ নিষিদ্ধ হয়েছিল ১৩ বছর আগে। এখন সরকার বলছে তারা এদের অফিস বন্ধ করা হচ্ছে। কিসের অফিস? এরা তো ১৩ বছর আগে থেকেই নিষিদ্ধ। নিরস্ত্র মানুষ নিয়মিত মারা যাচ্ছে। বিগত বছরগুলিতে মসজিদে, মন্দিরে, গীর্জায় ষাট হাজার যে নিরপরাধ পাকিস্তানি নাগরিক মারা গেছে তাদের জন্য কোনো ন্যায় বিচার নেই। যখন বেনজির ভুট্টো, সলমন তাদির বা শাহাবাদ ভাট্টি খুন হয় তখন আমি পাকিস্তানে ছিলাম। আমি সত্যকে নথিবদ্ধ করে যেতে চাই। আমার যৌবনের পাকিস্তানে কিছুটা হলেও কবি ফৈজ, গজল বা অন্য রাজনৈতিক মতবাদের কিছু চর্চা ছিল। আজ সব ধ্বংস হয়ে গেছে।

 আচ্ছা, শোনা যায় মাত্র ১ শতাংশ লোকই আজকের পাকিস্তানের মালিক?

 এক্কেবারে ঠিক। এই এক শতাংশই কেবল কর দেয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলতে যে মাপকাঠি বোঝায় তার সঙ্গে খাপ খাওয়াবার মতো কোনো শ্রেণী আজ পাকিস্তানে নেই। এদের নির্মূল করে দেওয়া হয়েছে। অথচ ১ শতাংশ ধনীরা যেভাবে জীবনযাপন করে তা দেখলে হতবাক হয়ে যেতে হবে। সে রাজকীয় বললে কম বলা হবে।

 পাকিস্তান সংখ্যালঘুরা কি একেবার ভয়ের বাতাবরণে থাকে?

 সংখ্যালঘুদের অবস্থা সত্যিই করুণ। শিয়াদের নিধন ধারাবাহিকভাবে হয়ে চলেছে। আর হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ যাদের পালাবার উপায় ছিল সব চলে গেছে। কেবলমাত্র ভিখারির অবস্থার লোক যাদের কোনো গত্যন্তর নেই তারাই পড়ে আছে। তাদের দেখার কেউ নেই। এখানকার মানুষ আজ কথা বলতে ভয় পায়। অথচ এক সঙ্গে স্বাধীন হওয়া ভারতের সংবিধান ছিল সমধর্মী। এটিই তোমাদের অর্জন।

 কিন্তু ভারতের নেতারা সব সময় নাগরিকদের সংবিধান অনুযায়ী চলার পথে নিয়ে যান। আপনাদের নেতারা পারেন না কেন?

 পিছনে তাকালে দেখা যাবে আদতে পাকিস্তানে প্রথম গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সরকার এসেছিল ১৯৭০ সালে। তার প্রধান ভুট্টোর ফাঁসি হয়। নওয়াজ তার প্রথম টার্ম শেষ করতে পারেননি। গত ৬৭ বছরে এটি আমাদের তথাকথিত দ্বিতীয় গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার। দেখুন, তার মেয়াদপূর্তি আটকাতেই পাঠানকোট।

(সৌজন্যে : টাইমস অফ ইন্ডিয়া)

প্রয়াত হলেন ড. হিমাংশুনারায়ণ চক্রবর্তী

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আবাল্য স্বয়ংসেবক ড. হিমাংশুনারায়ণ চক্রবর্তী গত ১৬ জানুয়ারি অমৃতলোকে যাত্রা করেছেন। কলকাতা মানিকতলা শাখার ১৯৫২ সালে স্বয়ংসেবক হন। তিনি ঢাকুরিয়া শাখার মুখ্যশিক্ষক ও পরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কার্যবাহের দায়িত্বে ছিলেন। সঙ্ঘের দ্বিতীয় বর্ষ শিক্ষিত, বলিষ্ঠ শরীরের এই স্বয়ংসেবক প্রথমে গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ও পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক হিসেবে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন এবং ক্রমে বিভাগীয় প্রধান রূপে তিনি উন্নীত হোন। তিনি এতই ছাত্রবৎসল ছিলেন যে ছাত্রেরা প্রতিদিন বিকালে তাঁর সঙ্গে থেকে আনন্দ লাভ করতেন এবং শাস্ত্রচর্চায় যুক্ত থাকতেন। অদ্বৈত বেদান্তের এই সুপ্রতিষ্ঠিত গবেষকের অধীনে অন্তত দশজন ছাত্রছাত্রী গবেষণা করে ডক্টরেট ডিগ্রি পান। তাঁদের অনেকেরই গবেষণাপত্র পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর নিজের গবেষণা-প্রবন্ধটি অদ্বৈত বেদান্তের এক দিগ্বিজয়ী গ্রন্থ। তাঁর কয়েকটি পুস্তক বিদ্বৎসমাজে সমাদৃত। ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যাস্বরূপ একটি গ্রন্থ প্রকাশকের দপ্তরে আটকে রয়েছে, তা শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। গ্লকোমাতে দৃষ্টিশক্তি হারানোর পরেও গ্রন্থটির শেষ অংশ যখন তিনি লেখেন তখন তা বাধ্য হয়েই শ্রুতিলেখকের সাহায্য নিয়ে সম্পন্ন করতে হয়েছে। তাঁর আত্মার শান্তি হোক এই প্রার্থনা।

গৌরীকেদার
শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ একই সঙ্গে তিন নামে তাঁর রেকর্ড বের হোত। গোলাম কাদের নামে ইসলামি গান, সুকুমার ভট্টাচার্য নামে পল্লীগীতি এবং স্বনামে বাংলা আধুনিক গান। তিনি ত্রিশ-চল্লিশ দশকের রোমান্টিক গানের জনপ্রিয় শিল্পী গৌরীকেদার ভট্টাচার্য। জন্ম চট্টগ্রামের পরৈকোরা গ্রামে। সালটা ১৯১৬। মাত্র দশ বছর বয়সে তিনি চলে আসেন কলকাতায়। ভর্তি হন রামরিক ইন্সটিটিউশনে। থাকতেন কালীঘাটে। সঙ্গীতচর্চাও চলত। একটু বড় হলে একটা ফাংশনে তাঁর গান শুনে মুগ্ধ অনুপম ঘটক গৌরীকেদারকে যোগাযোগ করিয়ে দেন হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানির সঙ্গে। ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম রেকর্ড— 'সুরের ধারায় স্নান করাবো'। নরেশ্বর ভট্টাচার্যের কথায় গোকুল মুখোপাধ্যায়ের সুর। ওই বছরেই ডিসেম্বর মাসে আর সুলতানের কথায় ও অনুপম ঘটকের সুরে রেকর্ড করেন দুটি ইসলামি গান। অবশ্য এর অনেক আগেই অর্থাৎ ১৯৩৩ সালে তিনি রেডিওতে গান গাইবার সুযোগ পান।

১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে শিল্পী কলম্বিয়া রেকর্ড কোম্পানিতে যোগ দেন। তিন বছর এক্সক্লুসিভ আর্টিস্ট রূপে তিন নামে তাঁর রেকর্ড বের হতে থাকে। ১৯৪১ সালের মে মাসে প্রণব রায়ের কথায় ও সুকৃতি সেনের সুরে তাঁর রেকর্ড 'কতদিন, কতদিন তুমি কাছে নাই' সুপার ডুপার হিট। আর এরপর থেকেই গ্রামোফোন কোম্পানি তাঁকে রয়ালটি দেওয়া শুরু করে। শিল্পীকে দিয়ে যখন যে রকম প্রয়োজন সেইরকম সব গান তাঁকে দিয়ে গাওয়ানো হোত। দেশ স্বাধীন হলো। শিল্পী গাইলেন, 'বল ভাই মাভৈ মাভৈ, নবযুগ ওই এল ওই'। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলো— শিল্পী গাইলেন, 'চক্রশোভিত তিনরঙা ওই জাতীয় পতাকাখানি, মানুষের মাঝে করিবে প্রচার সুখশান্তির বাণী'। দেশ ভাগের ফলস্বরূপ হাজার হাজার উদ্বাস্তু যখন বাঁধভাঙ্গা বন্যার মতো এদেশে আসছে তখন শিল্পীর কণ্ঠে গান, 'আমি এক বাস্তুহারা ভাই, আমি স্বদেশে বিদেশি হইলাম দেশ বলিতে নাইরে আমার দেশ বলিতে নাই।' সুভাষচন্দ্র নিখোঁজ। শিল্পী গাইলেন, 'বিপ্লবী নেতা হে বীর সুভাষ, তুমি তো এলে না ফিরে'। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে মানুষের দুঃখকষ্ট গেল না। শিল্পী গেয়ে উঠলেন, 'যদি দেশ স্বাধীন হলো, ও তুই স্বাধীনতার কি পেলি দান। তোর নাইরে অশন নাইরে বসন, দেহ আছে নাই তোরে প্রাণ'।

১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে চিত্রশিল্পী অমূল্য কুমার মুখোপাধ্যায়ের ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দৌহিত্রীর একমাত্র কন্যা শেফালীদেবীর সঙ্গে শিল্পী পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে জন্মায় তাঁর প্রথম সন্তান। এরপর শিল্পী যেন জনপ্রিয়তার জোয়ারে ভাসতে লাগলেন। বিরহের গানে তিনি ছিলেন এক নম্বর। মোহিনী চৌধুরীর কথায় শৈলেশ দত্তগুপ্তের সুরে 'নাই বা হল মিলন মোদের', শৈলেন রায়ের কথায়, কমল দাশগুপ্তের সুরে 'নিওনাগো অপরাধ; অরূপ ভট্টাচার্যের কথায় শৈলেশ দত্তগুপ্তর সুরে 'সমাধিতে ফুল ছড়াতে কে গো এলে'— এইসব গান লেখা ও সুরের মাধ্যমে সৃষ্ট বিরহী হৃদয়ের আর্তি শিল্পী গৌরীকেদারের কণ্ঠে যেন মূর্ত হয়ে উঠল। দূরদর্শনে একবারই তিনি গান গেয়েছিলেন। ১৯৭৯-র জানুয়ারি মাসে।

বহু বাংলা ছায়াছবিতেও সুর দিয়েছেন তিনি। গানও গেয়েছেন সেইসব ছবিতে। এরমধ্যে দেবকী বসু পরিচালিত অশোককুমার-কানন দেবী অভিনীত 'চন্দ্রশেখর', ইন্দ্রজাল, মৌচাকে ঢিল, পরশ পাথর, শাঁখা সিন্দুর বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। উত্তম কুমার অভিনীত একটি ছবিতে তাঁর গাওয়া গান, 'মরণ পথের যাত্রী ওরে' খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। এক সময় গ্রামোফোন কোম্পনি হিন্দী ছায়াছবির অত্যন্ত জনপ্রিয় কিছু গান হিন্দীতেই কলকাতায় গৌরীকেদারকে দিয়ে রেকর্ড করাত। মূল শিল্পীর গান যে লেবেলে (এইচ এম ভি বা কলম্বিয়া) হোত তার বিপরীত লেবেলে শিল্পীকে দিয়ে কলকাতায় গাওয়ানো হোত। এর মধ্যে আওয়ারা, শ্রী৪২০, রেল কা ডিব্বা, বৈজুবাওয়ারা, নয়াদৌড় উল্লেখযোগ্য। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত চারবছরে প্রায় ১৫০টি এ ধরনের হিন্দী ছবির গান শিল্পী করেছেন।

গৌরীকেদার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. যতীন্দ্রবিমল ও ড. রমা চৌধুরীর অনুরোধে বেশ কিছু সংস্কৃত গানে ও নাটকে সুর দিয়েছেন। শিল্পীর সুর করা গান তুলে নিতে তাঁর কাছে আসতেন ড. ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী, সত্যেশ্বর মুখার্জি, শিশির ভট্টাচার্য (শিবানন্দ গিরি) প্রমুখ বিশিষ্ট জন। ভারত সেবাশ্রমের স্বামী বিজয়ানন্দ শিল্পীর কাছে গান শিখতে আসতেন। তাঁর অনুরোধে শিল্পী বেশ কিছু সঙ্ঘগীতির স্বরলিপি করে দিয়েছিলেন।

জনপ্রিয়তার শীর্ষে থাকা অবস্থায় তিনি হঠাৎ রেকর্ড করা বন্ধ করেন। ফাংশনেও গাইতেন না। ১৯৭৪ সালের ২৩ এপ্রিল তিনি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। নাম হয় মোহন্ত চন্দ্রশেখর গিরি। তবে ছেলেমেয়েদের একান্ত অনুরোধে শেষ জীবনটা তিনি গৃহী সন্ন্যাসীরূপে গৃহেই কাটান। এক সময়ের জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী ট্রাজিক গানের হিরো গৌরীকেদার দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে রামকৃষ্ণ মিশন সেবায়তনে ১৯৮৩-র ৪ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গৌরীকেদার ভট্টাচার্যের জন্মশতবর্ষের স্মারক অনুষ্ঠান আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, সন্ধ্যা ৫-৩০ মিনিটে রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠিত হবে। স্মৃতিচারণা করবেন অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ ঘোষ, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, বিভাস চক্রবর্তী প্রমুখ। শিল্পীর গাওয়া গান গাইবেন পণ্ডিত শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকান্ত আচার্য ও রূপঙ্কর। তাঁর জীবন নিয়ে একটি তথ্যচিত্র 'তর্পণ' প্রদর্শিত হবে। প্রবেশ অবাধ। ■

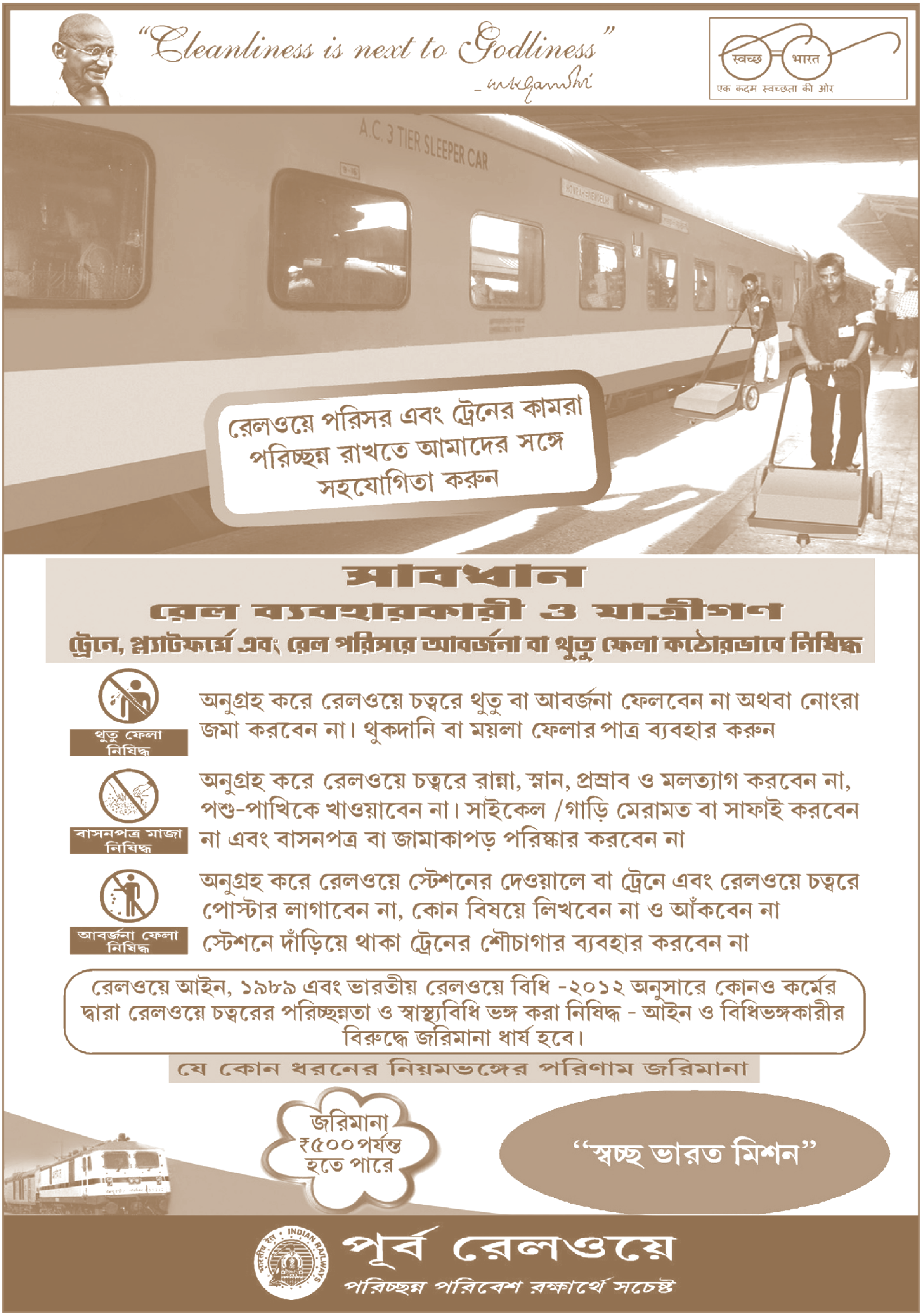

"Cleanliness is next to Godliness"
– M.K.Gandhi
स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर
A.C. 3 TIER SLEEPER CAR
রেলওয়ে পরিসর এবং ট্রেনের কামরা পরিচ্ছন্ন রাখতে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন
সাবধান
রেল ব্যবহারকারী ও যাত্রীগণ
ট্রেনে, প্ল্যাটফর্মে এবং রেল পরিসরে আবর্জনা বা থুতু ফেলা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ
থুতু ফেলা নিষিদ্ধ
অনুগ্রহ করে রেলওয়ে চত্বরে থুতু বা আবর্জনা ফেলবেন না অথবা নোংরা জমা করবেন না। থুকদানি বা ময়লা ফেলার পাত্র ব্যবহার করুন
বাসনপত্র মাজা নিষিদ্ধ
অনুগ্রহ করে রেলওয়ে চত্বরে রান্না, স্নান, প্রস্রাব ও মলত্যাগ করবেন না, পশু-পাখিকে খাওয়াবেন না। সাইকেল /গাড়ি মেরামত বা সাফাই করবেন না এবং বাসনপত্র বা জামাকাপড় পরিষ্কার করবেন না
আবর্জনা ফেলা নিষিদ্ধ
অনুগ্রহ করে রেলওয়ে স্টেশনের দেওয়ালে বা ট্রেনে এবং রেলওয়ে চত্বরে পোস্টার লাগাবেন না, কোন বিষয়ে লিখবেন না ও আঁকবেন না
স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনের শৌচাগার ব্যবহার করবেন না
রেলওয়ে আইন, ১৯৮৯ এবং ভারতীয় রেলওয়ে বিধি -২০১২ অনুসারে কোনও কর্মের দ্বারা রেলওয়ে চত্বরের পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি ভঙ্গ করা নিষিদ্ধ - আইন ও বিধিভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে জরিমানা ধার্য হবে।
যে কোন ধরনের নিয়মভঙ্গের পরিণাম জরিমানা
জরিমানা ₹৫০০ পর্যন্ত হতে পারে
"স্বচ্ছ ভারত মিশন"
পূর্ব রেলওয়ে
পরিচ্ছন্ন পরিবেশ রক্ষার্থে সচেষ্ট

SANHIT GROUP OF COMPANIES

Sriniketan Road, Bolpur, Birbhum, West Bengal - 731204

Phone : +91+3463-255-560 / 257-769, E-mail : sanhitpolymer@yahoo.co.in

Fax :+91-3463-254215

Factory : Shibtala-Surul Road, Bolpur, Dist. : Birbhum, West Bangal 731204, Phone : +91+3463-234517 / 645017 / 09732024706

APPLICATION

Industry & Packaging

- Jumbo Bag Liner
- Black Wraping Film
- Temporry Shed (by Film)
- Pallet Cover
- Shrink Wrapping Film for Black Goods

Civil & Construction:

- Construction Film for concrete
- Separation membrane for Road Construction
- Liner for Hazards West Pond
- Liner for Water Reservoir
- Disposal Glass & Cup

With Best Compliments From :-

MUKHERJEE ENGINEERING CO.

Manufacturer of

R. C. C. SPUN PIPES, COLLARS & ALLIED ITEMS

Head Office & Workshop

Sriniketan Road, Bolpur, Pin - 731 204

Phone : (03463) 254-215 (O), Mobile : 9434009737, 919434762433

E-mail : mukherjeeengineeringco@yahoo.com Fax : 03463-254215

LUX® cozi™
INNERWEAR
নিজের LUCK
পরে চলুন!
www.luxinnerwear.com
From the house of LUX
An ISO 9001:2008 Certified Company
Govt. Certified STAR EXPORT HOUSE
ASIA'S MOST PROMISING BRAND - 2013-2015
MASTER BRAND 2014-2015
THE WORLD'S GREATEST BRANDS & LEADERS 2015-ASIA &GCC
THE ADMIRED BRANDS & LEADERS OF ASIA 2015

দাম : ১০.০০ টাকা